মতামত ও লেখা পাঠানো সহ সমস্ত ধরণের যোগাযোগ:
সম্পাদক
শ্রমিক শ্রেণীর মুখপত্র
শ্রমিকশক্তি
১১, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলকাতা-৯
ফোন : ৯৪৩৩২৪২৪৯৮
(বৃহস্পতিবার, ১১-২ টা)
shramikshakti@gmail.com

শ্রমিক শ্রেণীর মুখপত্র

শ্রমিকশক্তি

ভিতরের পাতায়

- গোর্খাস্তানের দাবীতে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির স্মারকলিপি
- জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার
- পঞ্চায়েত থেকে পুরসভা— ভোটাররা পরিবর্তনমুখী
- নেপাল : কলকাতায় সংহতি সমারোহ
- বন্যার কবলে পটাশপুর

৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা | আগস্ট ২০০৮ | বিনিময়: ২ টাকা

টিটাগড় মাঠকলে আন্দোলনের জোরে
নির্দোষ শ্রমিকরা মুক্ত

সুশান্ত বোস: লড়াইয়ের জোরে আদায় করা হল নির্দোষ শ্রমিকদের মুক্তি। গত ১৫ মে থেকে মিথ্যে মামলায় ধৃত শ্রমিকনেতা অলিক চক্রবর্তী ও শঙ্কর দাস সহ ২১ জন শ্রমিকের দ্রুত মুক্তি এবং অবিলম্বে মিলে স্বাভাবিক উৎপাদন চালু করার দাবিতে সংগ্রামী মজদুর ইউনিয়ন (এস এম ইউ) টিটাগড়ের লুমটেক্স (মাঠকল) মিলে জোরদার আন্দোলনের জেরে ৩০ শে জুলাই কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে মুক্তি পান মিথ্যে অভিযোগে ধৃত ২০ জন। যদিও অন্যতম মূল সংগঠক অলিক চক্রবর্তী এখনও মুক্তি পাননি। শ্রমিকদের সঙ্গে এলাকার স্থানীয় অধিবাসীদের সমর্থন এবং স্বতস্ফূর্ত যোগদান এই পর্যায় জুড়ে আন্দোলনকে তীব্রতর করে তুলেছে। আন্দোলনে সহযোগিতা করছে এম.কে.পি., সি.এস.ডব্লু.টি.ইউ., বি.সি.এম.এফ-সহ বিভিন্ন লড়াকু শক্তি।

২৫ মে টিটাগড়ের ছোটাগান্ধী মোড়ে এক জনসভায় মালিকী শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে আরো জোরদার ও সংঘবদ্ধ লড়াইয়ের শপথ নেন শ্রমিকেরা। সভায় যোগদানকারী বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন মাঠকলের শ্রমিকদের এই লড়াইয়ের পাশে থাকবে বলে অঙ্গীকার করে। এস.এম.ইউ-র পক্ষ থেকে লেবার

শেষাংশ ৭ পৃষ্ঠায়

বর্ধমানের দিগনগরে ক্ষেতমজুরদের
মজুরীবৃদ্ধির লড়াইয়ে জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারের বর্ষার চাষের শুরুতে আউশগ্রামের দিগনগর অঞ্চলের ক্ষেতমজুররা ক্ষেতমজুর সমিতির পক্ষে মজুরীবৃদ্ধির দাবীতে ঐক্যবদ্ধ হয়। এতদিন ৪৫ টাকা ২ কেজি চাল মজুরী হিসেবে চলে আসছিল, এবারে ৫৫ টাকা ২ কেজি চালের দাবীতে ক্ষেতমজুররা সংগঠিত হতে শুরু করে। একটা পর্যায় জুড়ে নানা প্রচার আন্দোলন চলার পর, মধ্য ও ধনী কৃষকদের আলোচনায় বসার কথা বলা হয়, জানানো হয় যে আলোচনায় না বসলে ধর্মঘটের পথে যাবেন ক্ষেতমজুররা। জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে যখন সেই ধর্মঘট শুরু হতে যাবে, ঠিক তার আগে আলোচনায় বসে মধ্য ও ধনী কৃষকরা এবং ৫০ টাকা ২ কেজি চাল মজুরী দেওয়ার কথা মানতে বাধ্য হয়। সিপিএমের প্রভাবাধীন কৃষক সভা দাবী তুলেছিল ৪৮ টাকা ২ কেজি চাল, যা পরিষ্কার দেখায় যে তারা ক্ষেতমজুরদের চেয়ে মধ্য ও ধনী চাষীদের স্বার্থরক্ষা করছে। এই আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও বর্ধমান জেলা এমকেপি-র সম্পাদক গোপাল পাল জানান যে যেখানে যেখানে ক্ষেতমজুররা সংগঠিত হয়েছেন, সেখানেই দাবী আদায় হয়েছে, এই লড়াইকে জেলার অন্যত্রও বিকশিত করতে হবে। অন্যদিকে এমকেপি-র দীর্ঘ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে এবং গত ৩রা জুলাই বিএমওএইচ-এর কাছে এলাকার মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত ডেপুটেশন কর্মসূচীর ফলে দিগনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অন্তর্বিভাগ চালুর লিখিত প্রতিশ্রুতি মিলেছে। শীঘ্রই এলাকার উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির বেহাল দশা নিয়েও ডেপুটেশন দেওয়া হবে।

মঞ্চ গড়ে উঠলো একচেটিয়া
পুঁজির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি: একচেটিয়া পুঁজির ক্রমবর্ধমান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই ধীরে ধীরে সংগঠিত হচ্ছে। একের পর এক শপিং মল, বিগ বাজার গড়ে উঠছে একদিকে, খুচরো ব্যবসার একটা বড় অংশ গ্রাস করছে এই সমস্ত দেশী-বিদেশী বড় পুঁজিপতিরা, আর অন্যদিকে তারই ফলস্বরূপ উঠে যেতে বসেছে পুরনো বাজারগুলো, ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে ছোট ব্যবসায়ীদের, এমনকি ঐ পুরনো দোকান-বাজারকে কেন্দ্র করে আরও যারা জীবিকা নির্বাহ করতেন, তাদেরও জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয়ে উঠেছে।

এই সামগ্রিক আক্রমণের বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্তভাবে লড়াইয়ে সামিল হয়েছেন

শেষাংশ ৫ পৃষ্ঠায়

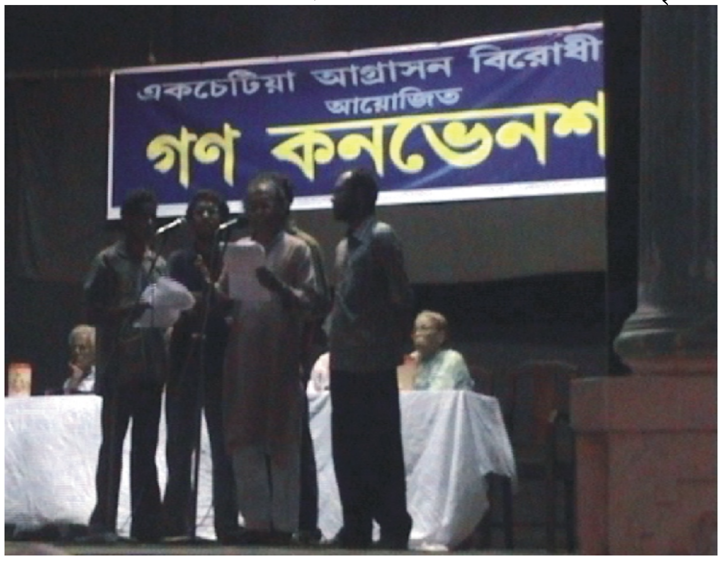

কারখানার অব্যবহৃত জলাজমি বুজিয়ে রিয়েল এস্টেট
লড়াইয়ে সামিল হিন্দমোটরের মানুষ

সমাপ্তি সরকার: হিন্দমোটর কারখানার ৭০৯ একর জমির মধ্যে ৩১৪ একর জমি কারখানা তৈরীর সময় থেকেই অব্যবহৃত পড়ে ছিল, যার মালিকানা বিড়লা মালিকদের না থাকলেও শিল্পের কাজে ব্যবহার করার অধিকার তাদের পুরোপুরি ছিল। ২০০৬ সালের আগস্ট মাসে ক্যবিনেট মিটিং-এ শিল্পের জন্য দেওয়া জমির মালিকানা কারখানা মালিককে দেওয়ার আইন চালু হয়- এর ফলে বিড়লা মালিক হিন্দমোটর কারখানা সংলগ্ন ৩১৪ একর জমির মালিকানা পায়। ওই জমির দাম বাবদ বিড়লা মালিক সরকারকে সাড়ে দশ কোটি টাকা দেয় অথচ শ্রীরাম প্রপার্টিজ-এর কাছে জমি বেচে পায় ২৯৫ কোটি টাকা। শ্রীরাম প্রপার্টিজ এই ৩১৪ একর জমিতে আইটি টাউনশিপ গড়ে তুলবে, যা হবে একটি বিশেষ আর্থিক অঞ্চল (সেজ), যার অংশ বিক্রী প্রতি বিড়লা মালিক ৪ শতাংশ হারে টাকা পাবে। বিজনেস লাইন পত্রিকায় শ্রীরাম প্রপার্টিজের মুখপাত্র সোনি শ্রীবাস্তব জানান এই ৩১৪ একরের মধ্যে মাত্র ৫৪ একরে আইটি আর বাকিটা রিয়েল এস্টেট হবে। এবং এর জন্য ১০০ একর জলাভূমি বুজিয়ে ফেলা হবে। এই জলাভূমি বোজানোর বিরুদ্ধে, সেজের বিরুদ্ধে, শিল্পের জমিতে শিল্প করার দাবীতে হিন্দমোটর কারখানার লড়াকু ইউনিয়ন এসএসকেইউ, হুগলী এপিডিআর, গণউদ্যোগ, ডঃ দ্বারকানাথ কোটনিশ স্মৃতিরক্ষা কমিটি সহ ১১টি সংগঠন মৎসদপ্তর সহ বিভিন্ন জায়গায় ডেপুটেশন দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে হুগলী জেলা মৎসদপ্তর বেঙ্গল শ্রীরাম হাইটেক সিটি প্রাঃ লিঃ-র দেবজ্যোতি ঘোষের (ইনি আবার দমকল মন্ত্রী প্রতিম চ্যাটার্জীর জামাই) বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে। আগামী ২৩ শে আগস্ট উত্তরপাড়া গনভবনে এই ১১টি সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি কনভেনশনের ডাক দেওয়া হয়েছে।

একদিকে জমি প্রচুর দামে বিক্রী করে কোম্পানী লাভ করছে, অন্যদিকে শ্রমিকদের পাওনাগন্ডা না মিটিয়ে ভিআরএস নামাচ্ছে। একই সঙ্গে কোম্পানী এসএসকেইউ-এর অন্যতম সহ সভাপতি প্রেমশংকর রাইকে কাজ থেকে বরখাস্ত করেছে। এর বিরুদ্ধেও তীব্র আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে।

অন্যদিকে সেজ তৈরীর এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে হুগলী জেলা এমকেপি-র তরফে প্রচার আন্দোলন চলছে। আগামী ১৫ই আগস্ট একটি গণঅবস্থানের কর্মসূচী নেওয়া হচ্ছে। হিন্দমোটর কারখানায় যে সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের ওপর সাসপেনশন-টার্মিনেশনের আক্রমণ নামছে, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে হুগলী জেলা এমকেপি।

মূল্যবৃদ্ধির নেপথ্যে দায়ী সরকারী নীতি

কুশল দেবনাথ

বাজারে জিনিসের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, মাসিক মাহিনাভুক্ত চাকুরিজীবী থেকে দৈনিক মজুরি পাওয়া মানুষ মূল্যবৃদ্ধির দাপটে হাঁসফাঁস করছে। দানাশস্য, ডাল ভোজ্যতেল, চিনি, সব্জী প্রতিটি নিত্যব্যবহার্য জিনিসের দাম ঊর্ধ্বমুখী। এই দাম নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ব্যর্থ। সরকারের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে এই মূল্যবৃদ্ধি একটি আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্য এবং পেট্রোপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে আন্তর্জাতিক স্তরেই মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে। যদিও প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং আশ্বাস দিয়েছেন যে ভালো বর্ষা হলেই কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ভালো হবে এবং মূল্যবৃদ্ধি রোধ হবে।

১৯৯১ সালের নয়া আর্থিক নীতি গৃহীত হবার পর একবার শাসকশ্রেণী তাদের অতীতের নীতির এক বড়োসড়ো পরিবর্তন ঘটায়। উদারিকরণ, বেসরকারিকরণ, কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের নামে দেশি-বিদেশিরা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অবাধ মুনাফার সুযোগ আরো বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ তুলে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার। কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগ হ্রাস, ধাপে ধাপে ভর্তুকি প্রত্যাহার করা হয়। ফলতঃ বেড়ে গিয়েছে কৃষিতে সংকট। বহুজাতিক সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণাধীন বিশ্ববাজারের সামনে কৃষিক্ষেত্রের দরজা খুলে দেওয়ার পদক্ষেপ হিসাবে খাদ্যশস্যের বদলে বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন করতে বাধ্য হচ্ছে কৃষকরা। ফলতঃ বাড়ছে খাদ্যসংকট। এই নীতির অনিবার্য পরিণতিতে একদিকে অল্পসংখ্যক লোকের হাতে বিপুল পরিমাণে সম্পদ আরো বেশি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। অপরদিকে এদেশের সরকারি হিসাব অনুযায়ী এদেশে ৭০ শতাংশ মানুষের দৈনিক আয় দাঁড়িয়েছে ২০ টাকা বা তার কাছে। মূল্যবৃদ্ধি এই সমস্ত মানুষের জীবন অসহনীয় করে তুলেছে।

সরকারি নীতির ফলে এই মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে। খোলা বাজারের জন্য সবকিছু খুলে দিয়ে দিনের পর দিন দুর্বল করা হয়েছে গণবণ্টন ব্যবস্থা। খাদ্যশস্য সংগ্রহের প্রতিষ্ঠানগুলি কার্যত অচল করে দেওয়া হয়েছে। কিছুদিন আগেও যেখানে খাদ্যের স্বয়ম্ভরতার কথা বলা হতো, এখন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হচ্ছে। এই অসহনীয় মূল্যবৃদ্ধির প্রতিকারের পথ কী? সরকার দুহাত তুলে দিয়েছে। সরকারি বক্তব্য হলো, আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোপণ্যের দাম না কমায় কার্যত করার কিছু নেই। এই বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত হলো, পেট্রোপণ্যের দাম বাড়তে পারে এই জন্য সরকার, জনগণের উপর 'সেস্' বসিয়ে 'অয়েলপুল' অর্থবিল তৈরি করা হয়েছিল। এর জন্য প্রায় ১ লাখ কোটি টাকা সংগ্রহ হয়েছিল। সেই টাকা কোথায় গেল? দ্বিতীয়তঃ, এদেশে বেসরকারি তেল কোম্পানীগুলি সরকারি নীতির সুযোগে তেলক্ষেত্র থেকে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছে। তেল কোম্পানিগুলি তেল রপ্তানি করার জন্য পাচ্ছে ভর্তুকি সহ নানা কর ছাড়। এই কোম্পানিগুলির উপর কর বসালে বা কর ছাড় দেওয়া বন্ধ করলে পেট্রোপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। যে আমেরিকা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ভর্তুকি তুলে দেবার কথা বলে তারাই নিজের দেশের ক্ষেত্রে পেট্রোপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তেল কোম্পানীর উপর কর ধার্য করে।

এবার আসা যাক গণবণ্টন ব্যবস্থার ভর্তুকির বিষয়ে। বাজারে মুদ্রাস্ফিতির ফলে দামের ওঠানামা হয়। এর জন্য দেশের মানুষের কথা ভেবে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের দাম বেঁধে দিতে হয়। এবং গণবন্টন ব্যবস্থাকে নীচুতলা থেকে

শেষাংশ ৫ পৃষ্ঠায়

সম্পাদকীয়
শ্রমিকশক্তি
৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আগস্ট '০৮

পরমাণু চুক্তি

দেশদ্রোহীরা দেশপ্রেমিক সাজছে

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে মনমোহন-সনিয়াদের দায়বদ্ধতা কতখানি তা বোঝা গেল অসামরিক চুক্তিকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে। সরকারি বামেদের সঙ্গে দীর্ঘ ৪ বছরের প্রণয়কাণ্ডে বিচ্ছেদ ঘটাতেও এতটুকু দ্বিধা করেনি মনমোহন সিং। যেটুকু সংশয় ছিল সরকার টেকানো নিয়ে তাও মিটে গেছে এককালের ঘোরতর শত্রু মূলায়মদের সঙ্গে পেয়ে। কিসের বিনিময়ে এই নতুন প্রেম তার সবটা হয়ত কোনদিনই জানা যাবে না। তবে উত্তরপ্রদেশে 'দলিতরানী' মায়াবতী যেভাবে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তাতে সমাজবাদী পার্টির এখন অস্তিত্ব রক্ষাই নতুন দায়। দলিত ভোটের সঙ্গে হিন্দু উচ্চবর্ণ ভোটের এমন শক্তিশালী জোটের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে হলে সপা-কে কংগ্রেস ছাড়া আর কেই বা অক্সিজেন দিতে পারে? কেন্দ্রীয় সরকারের আশীর্বাদ পেলে আপাততঃ মায়াবতী সরকার থেকে ছুটে আসা তীরগুলো কিছুটা সামাল দেওয়া যাবে, অন্যদিকে মায়াবতীর দূর্নীতিসংক্রান্ত বিষয়গুলো সিবিআই-কে দিয়ে খুঁচিয়ে মায়াবতীকেও নাজেহাল করা যাবে।

ইদানীং ভারতীয় রাজনীতিতে একটা কথা চালু হয়েছে—রাজনীতিতে সবকিছুই সম্ভব'। কেউ কারও জন্য দরজা চিরকালের মতো বন্ধ করে দেয় না। আজ যে প্রধান শত্রু কালই সে প্রধান মিত্র হযে যায়। আসলে ক্ষমতাই হলো প্রধান কথা।

তবে পরমাণু চুক্তির প্রশ্নে কোন কোন দল আবার সংসদীয় ক্ষমতা বা জোটের বাইরে গিয়েও তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এরা এনডিএ জোটের শরীক হয়েও পরমাণুচুক্তির পক্ষে। মনমোহন সিং এবং কংগ্রেস দল পরমাণু চুক্তি করাটাকে একটা বেশ দেশপ্রেমিক কাজ হিসাবে দেশবাসীকে দেখাতে চাইছে। মার্কিন প্রেমী মিডিয়াও প্রায় সেভাবেই বিষয়টাকেই প্রচার করছে। এজন্য তাদের বামবন্ধুদের সমালোচনা করতেও তারা কসুর করছে না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুগত প্রাক্তন বিজ্ঞানী রাষ্ট্রপতিও এই দেশবিরোধী চুক্তির পক্ষে প্রচার করতে রাস্তায় নেমেছেন। যারা খোলাখুলি পক্ষে প্রচার করছে তাদের তবু বোঝা যায়। কিছু ছোট ছোট আঞ্চলিক দল আছে তাদের কোন নীতিগত বক্তব্যই নেই। তারা ঝোপ বুঝে কোপ মারার অপেক্ষায়। এমনকি এদের কেউ কেউ প্রচুর টাকা এবং মন্ত্রিত্বের বিনিময়ে আস্থাভোটে কংগ্রেসের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। প্রধান বিরোধী দল বিজেপি নীতিগতভাবে চুক্তির বিরোধী নয়। কিন্তু ইউপিএ ও বামেদের এই বিরোধকে সংসদীয় রাজনীতিতে ব্যবহার করার যে সুযোগ তারা পেয়েছে তার সদ্ব্যবহার করার জন্য তারা কিছু কৌশলগত প্রশ্ন রেখে তারা আস্থা ভোটে ইউপিএ-কে হারানোর চেষ্টা করেছে। যদিও তাদের দলের এবং শরীক দলগুলির কয়েকজন সাংসদ ডিগবাজী খাওয়ায় বিজেপি এই আস্থা ভোটে বিশেষ ফয়দা তুলতে পারেনি।

অন্যদিকে সিপিএম কিছুটা বেকায়দায় পড়লেও তারা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাদের বামপন্থী ইমেজটাকে আবার কিছুটা ঝালিয়ে নিতে পেরেছে। কিন্তু সিপিএম খেলাটা যেভাবে খেলতে চেয়েছিল কংগ্রেস তাদের সেভাবে খেলতে দেয়নি। এতে কংগ্রেস শেষপর্যন্ত কতটা লাভবান হবে বলা মুস্কিল। তবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় রাজনীতির যে সম্পর্ক তাতে এই চুক্তি করা মনমোহনদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন হল সিপিএম হঠাৎ এত 'বিপ্লবী' হয়ে উঠল কেন? যে সিপিএম সাম্রাজ্যবাদী কৃষিনীতি মেনে নিয়েছে, যে সিপিএম 'সেজ' আইন কার্যকরী করছে, কুখ্যাত বীজ আইন মেনে নিয়েছে, যারা বিভিন্ন মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানীকে পশ্চিমবাংলায় সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এমনকি হরিপুরে পরমাণু কেন্দ্র করার জন্য নিজেরা উদ্যোগী হযেছে এহেন সিপিএম হঠাৎ এই চুক্তির প্রশ্নে সমর্থন তুলে নেওয়ার মতো অবস্থান নিলো কেন?

আসলে সিপিএম-এর রাজনীতির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিষয়টি যুক্ত। একটি বামপন্থী দল হিসাবে, শ্রমিক কৃষকের পার্টি হিসাবে সিপিএম-এর উত্থান হয়েছে। বহু বামপন্থী বুদ্ধিজীবী সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই দলের সঙ্গে এখনও আছেন, বহু শ্রমিক কৃষক এখনও এই দলের সদস্য সমর্থক। সিপিএমকে তাই একটা বামপন্থী ইমেজ, ঢং ঢাং তার আচার আচরণের মধ্যে রাখতে হয়। একদিকে সে পশ্চিমবঙ্গ, কেবল বা ত্রিপুরায় ক্ষমতায় থেকে পুঁজিবাদের সেবা করে, সাম্রাজ্যবাদীদের বিস্বায়নের নীতিকে সর্বশক্তি দিয়ে কার্যকরী করে অন্যদিকে সে ইরাকযুদ্ধের বিরুদ্ধে বড় মিছিল করে, ওয়ার্ল্ড সোশাল ফোরামে গিয়ে বিশ্বায়ন বিরোধী বক্তৃতা দেয়। তারা সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত কোন বিরোধিতা না করেই একটা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ইমেজ তৈরি করেছে, সেটাকে ধরে রাখতে চায়। পরমাণু চুক্তির বিরোধিতা ছিল তেমনই একটা যা সিপিএম-এর এই দ্বিচারিতাকে রক্ষা করার পক্ষে একটা চমৎকার ইস্যু। একটা টানটান টেনশন রেখেই তারা কংগ্রেসের সঙ্গে ঘর বেঁধে থাকতে চেয়েছিল, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নিজেদের প্রাসঙ্গিক করতে চেয়েছিল। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে কৃষক হত্যার পর তাদের বামপন্থী ইমেজ যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, যেভাবে তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের কৃষকেরা, তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য পরমাণু চুক্তির মতো ইস্যুকে জোরেসোরে আঁকড়ে ধরা ছাড়া সিপিএম-এর আর গত্যন্তর ছিল না। তারা ভেবেছিল সরকার রক্ষার দায়ে কংগ্রেস তাদের কাছে এসে রফাসূত্র চাইবে। কিন্তু কংগ্রেস আরও বড় খিলাড়ি। তারা মূলায়মের সাথে লাইন করে সিপিএম-কে অগ্রাহ্য করলো। সমর্থন প্রত্যাহার করা ছাড়া সিপিএম-এর সামনে অন্য কোন রাস্তা খোলা ছিল না। তবে সিপিএম যাই করুক শ্রমিক-কৃষক এবং সাচ্চা বামপন্থী মানুষের কাছে কিন্তু তার দেউলিয়া রাজনীতি স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে এই ইস্যুতে প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের দেউলিয়াপনা আজ স্পষ্ট। দেসের স্বার্থ এদের কারও কাছেই প্রধান বিষয় নয়, যে যার নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত। শুরু হয়ে গেছে আগামী লোকসভা নির্বাচনের অঙ্ক কষা।

স্বাধীন গোর্খাস্তানের দাবীতে ১৯৪৫-এ অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির স্মারকলিপি

(নিপীড়িত জাতিসত্ত্বার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে ১৯৪৫ সালে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি গোর্খাস্তানের দাবি করেছিলো। সেই দাবি সম্বলিত স্মারকলিপির প্রধান অংশ অনুবাদ প্রকাশ করা হল। পুরনো নথির কিছু অংশের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি, আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।)

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মতে, দার্জিলিং জেলা, গোর্খাদের— এটি তাদের হোমল্যান্ড। কমিউনিস্ট পার্টি আরও মনে করে, দার্জিলিং জেলা, সংলগ্ন সিকিম রাষ্ট্র এবং তথাকথিত স্বাধীন নেপাল রাষ্ট্রে বসবাসকারী গোর্খারা মিলিতভাবে একটি নির্দিষ্ট জাতিসত্বা গড়ে তুলেছে। যাদের জনসংখ্যা যথাক্রমে তিন লক্ষ, এক লক্ষ ও ষাট লক্ষ এবং যাদের একটি সাধারণ ভাষা, সাধারণ সংস্কৃতি এবং বুদ্ধ ও অশোকের সময় থেকেই একটি সাধারণ ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার আছে। এই তিনটি অঞ্চল পরস্পরের লাগোয়া এবং গোর্খারা এই অঞ্চলে সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ— শতকরা প্রায় পঁচাশি ভাগ। ভারত বিজয়ের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই গোর্খাদের জোর করে বিভক্ত করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে গোর্খাদের জাতীয় উন্নতি ও বিকাশে বাধা সৃষ্টি করেছে। হোমল্যান্ড ছাড়াও গোর্খারা সারা ভারতে (যথা আসাম, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ইত্যাদি) সংখ্যালঘু হিসাবে ছড়িয়ে আছে। সুতরাং তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায় এবং তাদের ন্যায়সংগত অধিকারগুলিকে ভারতের নতুন সংবিধানে উপযুক্তভাবে রক্ষা করতে হবে। সুতরাং দার্জিলিং জেলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে যারা এই জেলার ন্যায়সংগত অধিকারী সেই গোর্খাদের বিশ্বস্ত প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ করতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টির মতে, গোর্খা জনগণকে পুরোপুরি গণতন্ত্রের ভিত্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়াটাই হচ্ছে তাদের জাতীয় বিকাশের একমাত্র পথ। যার অর্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, তার উপগ্রহ-স্বরূপ সিকিমের এবং তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্র নেপালের মধ্যযুগীয় সামন্ত শাসনের অবসান ঘটানো।

সুতরাং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দাবি হল— দার্জিলিং জেলা সিকিমের দক্ষিণাঞ্চল এবং নেপাল এই তিনটি সংলগ্ন এলাকার সীমানাগুলির প্রযোজনীয় পরিবর্তনের পর একটি অঞ্চল গড়ে তোলা দরকার যার নাম হবে গোর্খাস্তান। সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ রযেছে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা দার্জিলিং জেলা আসাম ও ডুয়ার্সের অন্যান্য উপজাতিদের নিয়ে একটা নতুন প্রদেশ করার মতলব আঁটছে যার নাম উত্তরপূর্ব হিমালয় পার্বত্য রাজ্য।

কমিউনিস্ট পার্টি দাবি করে— দার্জিলিং জেলাকে "আংশিক বিবর্জিত" এলাকা হিসাবে ঘোষণা করার ১৯৩৫ সালের ভারত সরকারের আইনকে এখনই তুলে নিতে হবে। গোর্খা ও এই অঞ্চলে বসবাসকারী অন্যান্য পার্বত্য উপজাতিদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নতির প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে আমলাতন্ত্রের বিশেষ ক্ষমতা রোধ করতে হবে।

ভারতের অন্যান্য অংশে বসবাসকারী গোর্খাদের সমস্যা

এটা ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে যে গোর্খাদের সমস্যা শুধুমাত্র দার্জিলিং জেলাতেই সীমাবদ্ধ নয়। ভারতের অন্যান্য অংশেও গোর্খারা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বাস করেন। যেমন, আসাম, যুক্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাব। কমিউনিস্ট পার্টি গণপরিষদের সম্মানীয় সদস্যদের মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, গোর্খাদের সমস্যাকে দূরে সরিয়ে রাখা যাবে না। এর সমাধান করতেই হবে। যার ফলে সাধারণভাবে ভারতীয় সংখ্যালঘুদের সমস্যা কার্যকরীভাবে সমাধান করা যায়। যদি প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ও আনুপাতিক প্রতিনিধিদের নীতি সারা দেশে গৃহীত হয় তবে পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, আসাম ও অন্যান্য জায়গায় বসবাসকারী গোর্খারাও আইন সভায় সেই সেই প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব পেতে পারবে। কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে যে, গণপরিষদ এইভাবে তাদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করতে পারে।... প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এই ইস্যুতে উক্ত অঞ্চলগুলিতে গণভোট অনুষ্ঠিত করা যেতে পারে, যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ গোর্খারা একটি অঞ্চচলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পক্ষে মত দেয় তবে তা গ্রহণ করতে হবে। এই নতুন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিসত্বা ও পাহাড়ী উপজাতিদের ন্যায়সংগত অধিকারগুলিকে রক্ষা করার উপযুক্ত ব্যবস্থা এই অঞ্চলের নতুন সংবিধানে রাখতে হবে। নেপাল, সিকিম ও দার্জিলিং জেলার বসবাসকারী গোর্খাদের পুনর্মিলনের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে কেবলমাত্র প্রকৃত স্বাধীন ভারতবর্ষে— যখন সে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, তার উপগ্রহ-স্বরূপ নেপাল ও সিকিমের মধ্যযুগীয় শাসনের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে দেবে। যেহেতু, এটা নির্ভর করছে সমগ্রভাবে গোর্খা জনসাধারণের জাতিগত ও রাজনৈতিক বিকাশের ওপর তাই যতদিন পর্যন্ত না গোর্খাস্তান গড়ে উঠছে ততদিন ব্রিটিশ ভারতে বসবাসকারী গোর্খাদের স্বার্থরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টি বর্তমান গণপরিষদের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে এবং সর্বজন স্বীকৃত সংবিধান গ্রহণ করার বিষয়টিকে বানচাল করার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কৌশল সম্পর্কে অবহিত আছে।...

দার্জিলিং জেলাকে অবশিষ্ট ভারত থেকে বাদ দেওয়ার ব্রিটিশ কু-মতলবকে পার্টি তীব্রভাবে বিরোধিতা করছে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে দার্জিলিং হিল মেনস্ এ্যাসোসিয়েশন্, ভারতের সেক্রেটারী অব স্টেটস্, লর্ড পেথিক লরেন্স-এর কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠিয়েছিল। তাদে দাবি করা হযেছিল অবশিষ্ট ভারত থেকে পৃথক করে দার্জিলিং জেলাকে চীফ কমিশনারের অধীনে একটা আলাদা প্রদেশ করা হোক। এই এ্যাসোসিয়েশন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্থানীয় এজেন্টদেরই প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্থানীয় এজেন্টরা এই ধরনের অন্যান্য পরিমার্জিত নিয়ে বা বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি এই দাবি করছে না। বরং ভারতের অন্যান্য অনগ্রসর জনগণের সাথে গোর্খা পাহাড়ী উপজাতিদের এক স্তরে নিয়ে আসার জন্য এটা প্রযোজন। যাতে করে স্বাধীন ও সুখী ভারতে সকলের উন্নতি সুনিশ্চিত হয়। গোর্খা এবং অন্যান্য পাহাড়ী জনগণের আকাঙ্ক্ষিত নতুন ভারতের স্বপ্নের ক্ষেত্রে এটা শুধুমাত্র বিস্ময়েরই সৃষ্টি করবে না, চরম ট্র্যাজেডি নিয়ে আসবে যদি দেশের প্রধান রাজনৈতিক সংস্থা গোর্খা ও অন্যান্য পাহাড়ী জনগণকে পশ্চাৎপদ ও অজ্ঞ করে রাখার সাম্রাজ্যবাদী উত্তরাধিকার বহন করে চলে। গণতন্ত্রের জন্য লড়াই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। ও সামন্ত রাজ্য নেপাল, সিকিম এবং দার্জিলিং-এর গোর্খা জনগণকে নিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠন করার ক্ষেত্রে তারা যদি গোর্খাদের উৎসাহিত করে তবে কমিউনিস্ট পার্টি নিশ্চিতভাবেই মনে করে যে গোর্খারা শুধুমাত্র ভারতীয় ইউনিয়নেই যুক্ত হবে না। তারা সামগ্রিকভাবেই সমগ্র ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতার সর্বোত্তম রক্ষক হযে উঠবে। তাদের চমৎকার সংগ্রামী চরিত্র সারা পৃথিবীতে খ্যাত। তাদের উন্নতির জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করলে তারা সারা ভারতের গৌরব এবং ভারতের স্বাধীনতার শত্রুদের আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠবে। তাদের গুরুত্বকে খাটো করা, সমস্যাকে উপেক্ষা করা কিম্বা তাদের ন্যায্য দাবিকে অবজ্ঞা করার অর্থ হোল ভারতের শত্রুদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে ওঠা তাদের (সাম্রাজ্যবাদীদের) অনেক দিনের অনুসৃত 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতি অনুসরণ করা।

ভারতের সংখ্যালঘু বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির সাব-কমিটি এখানে বিচ্ছিন্ন ও আধা-বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলি সম্পর্কে রিপোর্ট সংগ্রহ করার জন্য এসেছেন। তাদের মাধ্যমে এই স্মারকলিপি দেশের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক সংস্থা গণপরিষদের কাছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পেশ করছে। কমিউনিস্ট পার্টি আশা করে এই বিষয়টি তাদের যথোপযুক্ত মনোযোগ ও গভীর বিবেচনা পাবে।

গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন

জাতিসত্ত্বার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রসঙ্গে

শমীক চক্রবর্তী

গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে আন্দোলন নিয়ে রাজ্য রাজনীতি সরগরম। আন্দোলনের আঁচ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও গিয়ে পড়েছে। ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে কি হবে না, কেন্দ্র ঠিক কি করতে চলেছে, রাজ্য কিভাবে সামাল দেবে, মোর্চা সুর নরম করলো নাকি হটকারিতা— বাজারি মিডিয়াগুলোর তা নিয়ে বিশ্লেষণের অন্ত নেই। গোটা ব্যাপারটাই যেন কেন্দ্র-রাজ্য আর পাহাড়ের কেষ্টবিষ্টুদের দাবার চালের খেলা— পাহাড়ের জনগণের, মেহনতী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনো প্রতিচ্ছবি চলতি সংবাদমাধ্যমগুলোতে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। কেউ কেউ তাদের লেখায় বা বক্তব্যে পাহাড়ের মানুষের বঞ্চনা আর অভিমানের কথা একটু-আধটু তুললে হা হা করে উঠেছে তথাকথিত রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা, পুঁজিপতি মহল আর মিডিয়ার বসেরা। আগে বলুন, বাংলা ভাগ হবে না, তারপর অন্য কথা। না হলে আপনি 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'প্রাদেশিকতা করেছেন', 'বিদেশী শক্তির উসকানিতে সায় দিচ্ছেন' ইত্যাদি...।

শ্রমিকশক্তির কয়েকমাস আগের একটি সংখ্যায় গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের ইতিহাস, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর তার বিপরীতে বাজনৈতিক দলগুলোব বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস নিয়ে একটা লেখা প্রকাশিত হয়। এখন যখন আন্দোলন আরো গড়িয়েছে, তখন আর একবার বিষয়ের গভীরে যাওয়া প্রয়োজন। দার্জিলিং-এর ইতিহাসের গতিপথটা একবার ফের দেখে নেওয়া যাক।

ইতিহাস কথা কও

সিকিমের দখলে থাকা দার্জিলিং ব্রিটিশরা দখল করে টুমলুং-এর চুক্তির মাধ্যমে। ১৮৬৫-র ভূটানযুদ্ধের পর কালিম্পং-ও ব্রিটিশদের দখলে আসে। দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং নিয়ে তৈরি হয় আজকের দার্জিলিংয়ের মানচিত্র। ব্রিটিশরা এখানে স্বাস্থ্যনিবাস বানায় ডঃ ক্যাম্পবেল-এর তত্ত্বাবধানে। সেটা ১৮৩৯ সাল। তারপর থেকে নেপাল, সিকিম, ভূটান এবং সমতল থেকে লোকজন এখানে বসবাসের জন্য আসতে শুরু করে। দ্রুত বিকশিত হতে থাকে দার্জিলিং। ১৮৫০-এ যেখানে জনসংখ্যা ছিল ১০,০০০ সেটা নতুন শতাব্দী আসতে না আসতে দাঁড়ায় ২,৪৯,১১৭-তে। একদিকে গড়ে উঠতে থাকে চা বাগান, ফলতঃ চা বাগানে বাড়তে থাকে কর্মসংস্থান আর অন্যদিকে বিভিন্ন যুদ্ধের গোর্খা সেনাদের বিশেষ ভূমিকা দেখে সৈন্যবাহিনীতে তাদের নিয়োগ করার হিড়িক পড়ে যায়। চা-শ্রমিক এবং গোর্খা রেজিমেন্ট— এই দুধরণের ক্ষেত্রে কাজ পাওয়ার আশায় বাড়তে থাকে এখানে আসার প্রবণতা। ১৮৭২ সালে যেখানে চা বাগানের সংখ্যা ছিল ৭৪টি, ১৯০১ সালে তাই বেড়ে দাঁড়ায় ১৭০-এ। দার্জিলিং প্রশাসনিকভাবে কার সাথে যুক্ত হবে এ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষে তাকে যুক্ত করা হয় ভাগলপুর ডিভিশনের সাথে। ওদিকে দ্রুততার সাথে লেপচা, ভূটিয়াদের তুলনায় নেপালি জনসংখ্যা বেড়েছে, ভাষা হিসেবে নেপালির প্রসার ঘটেছে ব্যাপকভাবে। শিক্ষাব্যবস্থা এখানে ইউরোপীয়দের প্রয়োজনে গড়ে উঠলেও পরবর্তীতে মূলতঃ জার্মান মিশনারীদের উদ্যোগে সাধারণের জন্য শিক্ষার প্রসার ঘটে। যার অনেকাংশেই অবদান রয়েছে পৃথক জাতিসত্ত্বা হিসেবে স্বীকৃতির আকাঙ্ক্ষা তৈরিতে। আর একটা উপাদান অবশ্যই ভাষা। পরশমণি প্রধান, সূর্যবিক্রম ঘেওয়ালি, ধরনীধর শর্মাদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে নেপালি সাহিত্য সম্মেলন, যা ভাষার প্রশ্নে মানুষকে সমাবেশিত করতে থাকে।

দার্জিলিংয়ের লেবং-এ গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার বিশাল সমাবেশ

শতবর্ষ পুরোনো দাবি

'পৃথক প্রশাসনিক ইউনিট'-এর দাবি পাহাড়ের মানুষের পক্ষে প্রথম পেশ হয় ১৯০৭ সালে। নেপালি, ভূটিয়া এবং লেপচা জনজাতির মানুষের পক্ষে এই দাবি এরপর আবার ১৯১৭ এবং তারপর ১৯৩০-এ পেশ করা হয়। ক্রমশঃ রূপ নেয় গোর্খা পরিচয়টা। সেনাবাহিনী ফেরত গোর্খা সেনারা এই দাবির পাশে সমাবেশিত হতে তাকে। এই বিভিন্ন দাবিপত্র পেশ করার ক্ষেত্রে নানাসময়ে অবশ্য মানচিত্রের ভিন্নতা ছিল। ১৯৪৫-এ সংগঠিতভাবে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি পৃথক গোর্খাস্থান রাষ্ট্রের দাবি তোলে— নেপাল, দার্জিলিং আর সিকিমের অংশবিশেষ নিয়ে। পাহাড়ের মানুষ অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিকে নির্বাচনে জিতিয়ে তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে। পাহাড়ের নেতারা— রতনলাল ব্রাহ্মণ, গণেশলাল সুব্বারা এই নিয়ে তারপর দরবার করে গেলেও পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই দাবি থেকে ক্রমশঃ পিছু হটে যায়। এরপর কিভাবে জনসমর্থনের ঢল কখনও গোর্খা লীগের প্রতি, কখনও জিএনএলএফ কিংবা আজ গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার দিকে ঢলেছে, সে ইতিহাস আমরা আগে প্রকাশ করেছিলাম। পাহাড়ের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নস্যাৎ করার ফলস্বরূপ কিভাবে পাহাড় থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সিপিএম, সেও এক অদ্ভুত গতিপথ। ১৯৯৬ সালে পাহাড়ে সিপিএম পুরোপুরি ভেঙ্গে গিয়ে গড়ে ওঠে সিপিআরএম। সিপিআরএম-ও গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে আন্দোলনে সামিল। তাদের হাত ধরে অন্ততঃ পাহাড়ে এই বার্তাটুকু বেঁচে আছে যে বামপন্থায় জাতিসত্ত্বার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত, সিপিএমের বা তার আগে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির বিশ্বাসঘাতকতার ফলে যা নিয়ে ভ্রান্তি ছড়িয়েছিল মানুষের মধ্যে।

নিপীড়িত জাতিসত্ত্বার আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার

বিভিন্ন আকারে, বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন দাবি ও কারণকে সামনে রেখে বিশ্বের নানা প্রান্তে নিপীড়িত জনজাতির মানুষ লড়াইয়ে সামিল থেকেছেন। সেই লড়াই কখনো পৃথক রাজ্যের, কখনো পৃথক রাষ্ট্রের, কখনো আরও সামাজিক সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক অধিকারের দাবি নিয়ে। কাশ্মীরে, উত্তর-পূর্ব ভারতে কিংবা বিশ্বের মানচিত্রে কুর্দ, চেচেন, বাস্ক বা ক্যাটালোনিয়ান জাতিসত্ত্বার মতো বহু লড়াইয়ের কথা আমরা মাঝেমধ্যে শুনি। এত আত্মত্যাগ, এত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ দেখা গেছে নিপীড়িত জাতিসত্ত্বার লড়াইয়ে যে তার কোন ইয়ত্তা নেই। বিপরীত ছবিটাও আছে। অসংখ্য লড়াই আদর্শহীনতা, সুবিধাবাদিতা, স্বজন-পোষণের কানাগলিতেও হারিয়েছে। বামপন্থী আন্দোলন বা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে নিপীড়িত জাতিসত্ত্বার আন্দোলনগুলির রূপ বা সারমর্ম নিয়ে গভীর চর্চা হয়েছে। মেহনতী মানুষের মুক্তির লড়াইয়ের বরেণ্য নেতারা— যেমন মার্কস, লেনিন, স্তালিনরা এবিষয়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। সাধারণভাবে, পুঁজিবাদ যখন প্রসার লাভ করে, মালিকরা যখন তাদের ব্যবসাকে দিগবিদিগে ছড়িয়ে দিতে চায়, তখন বিভিন্ন জনজাতির নিজস্ব অর্থনৈতিক কাঠামো বা উৎপাদনব্যবস্থার পাশাপাশি তাদের ভাষা, সংস্কৃতিতেও গভীর হস্তক্ষেপের চেষ্টা ঘটে। বিশ্বায়নের হাত ধরে যেভাবে আমাদের ভাষা, সংস্কৃতিকে তাদের তৈরি ছাঁচে ঢেলে বদলে নেওয়ার চেষ্টা চলছে, তাতে সহজেই বোঝা যায় যে ওসব ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা ঠিক কিরকম ঘটে। স্বাবাবিকভাবেই এর বিরুদ্ধে বাইরের পুঁজিপতি, মালিকদের আগ্রাসন-শোষণের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে নিপীড়িত জনজাতি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই নিপীড়িত জনজাতির লড়াইয়ের নেতৃত্বে থাকে আঞ্চলিক পুঁজিপতি-মালিকরা। কিন্তু আন্দোলন তীব্রতা পায় যখন সেই আন্দোলনে ঐ জনজাতির মেহনতী, গরীব, শোষিত মানুষের অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে ঘটে। ফলে লড়াইটা আগ্রাসী, প্রাধান্যকারী জাতির পুঁজিপতি মালিকদের নেতৃত্বে সেখানকার জনতার লড়াই। সেই লড়াইয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক বঞ্চনার কথা যেমন থাকে, তেমনই থাকে ভাষা-জাতিগত পরিচয়ের প্রশ্নও। এবার কথা হল, আমরা সেই লড়াইকে সমর্থন করবো না বিরোধিতা। সোজা কথায় বড় পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জাতিসত্ত্বার লড়াই সফল হলে সেই অঞ্চলে বাইরের পুঁজিপতিদের প্রভাব খর্ব হবে, অঞ্চলের বা ঐ জাতির মধ্যেকার শ্রেণীবিন্যাস সবল হবে, শ্রেণীবিরোধ তীব্রতর হবে, মেহনতী মানুষ চিনতে পারবে তার উপর শোষণ-শাসনের নতুন নিয়ন্তাকে। কিন্তু এই নিপীড়িত জাতিসত্ত্বার লড়াই জয়লাভ না করলে বাইরের পুঁজিপতি-মালিকদের রমরমার সুযোগে এ অঞ্চলের উৎপাদিকা শক্তি বা পুঁজিবাদী বিকাশ ঘটবে না, শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর হওয়ার সুযোগ পাবে না, তাকে আড়াল করে রাখবে জাতির প্রশ্নটা। মেহনতী মানুষের মুক্তির লড়াইয়ে যারা সামিল, তাদের এই হিসেবটা বুঝতে হবে— এটাই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মহান পথ-প্রদর্শকদের শিক্ষা। অনেক বিষয়ে সতর্কতাও অবশ্য উচ্চারিত হয়েছে তাঁদের কলমে। যেমন ধরা যাক, প্রায়শই শোধনবাদী বা প্রতিক্রিয়াশীলরা প্রশ্ন তোলে যে কোন জনজাতি পৃথক হলে সেই রাজ্য বা রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে চলা সম্ভব কিনা। এখানে মেহনতী মানুষের পক্ষে যারা রয়েছেন, তাঁদের বুঝতে হবে যে এই চলা 'সম্ভব' কি 'সম্ভব না'-র মাথাব্যথাটা আসলে মালিকদের, পুঁজিপতিশ্রেণীর শাসকশ্রেণীর মাথাব্যথা, মেহনতী মানুষের জীবনের সাথে তার কোনও সম্পর্ক নেই। সতর্কতা আরও প্রযোজন। যেমন, জাতিসত্ত্বার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যদি শ্রেণীসংগ্রামের বার্তাকে সঠিকভাবে জারী না রাখা যায় তাহলে সেই জাতিসত্ত্বার লড়াইয়ের মোড়কে ঐ জাতির মালিক ঐ জাতির শ্রমিকের ওপর শোষণ চালাবে সুচতুর ভাবে, অথচ আপাত ঐক্য বজায় রাখবে বাইরের আধিপত্যকারী জাতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ধুঁয়ো তুলে। ফলে মেহনতী মানুষের স্বার্থরক্ষা করতে যারা চান তাদের যেমন— নিপীড়িত জাতি তাদের ভবিষ্যৎ নিজেরা নির্ধারণ করবে, এই স্বীকৃতি দিতে হবে, তেমনই জারি রাখতে হবে শ্রেণীসংগ্রামের প্রশ্ন, মালিকী রাজের অবসান না হওয়া পর্যন্ত। আর এই গোটা রাস্তা জুড়ে যেটা স্পষ্ট এবং শক্তিশালী করতে করতে যেতে হবে তা হল মেহনতী মানুষের পারস্পরিক সংহতি, মালিকশ্রেণীর শোষণের স্বরূপ উন্মোচন, শ্রেণীসংগ্রামকে সরলতর ও তীব্রতর করে তোলা। জাতিসত্ত্বার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের লড়াই তাকে সাহায্যই করে বৈকী।

কলকাতায় সিপিআরএম-এর মহাকরণ অভিযান কর্মসূচী

ধূসর তত্ত্ব থেকে জীবনের সবুজে

এরাজ্যের সাম্প্রতিক আন্দোলন প্রাণবন্ত করতে পারতো জাতিসত্ত্বার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নটাকে। সংগ্রামী বামপন্থী শক্তিগুলো সে কথা তুলেছে। আমরা, মেহনতী মানুষের পক্ষে যারা থাকতে চাই, গোর্খা জাতিসত্ত্বার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের এই লড়াইকে সমর্থন করি। কিন্তু সিপিএম? কিংবা অন্যান্য শাসকদলগুলো? তাদের পক্ষে এখন এসব কথা নৈব নৈব চ। অর্থনৈতিকভাবে সম্ভব কিনা পৃথক গোর্খাল্যান্ড বা পৃথক রাজ্য হওয়ার মধ্যে দিয়ে ওখানকার মেহনতী মানুষের আদৌ কোন সুরাহা হবে কিনা— না, এসব প্রশ্ন ওরা তোলেনি বললেই চলে। ওরা যে উগ্র বাঙালি জাত্যাভিমানে নিজেরা ভেসেছে, বাকি বাংলার জনগণকে সেই ভাবাবেগেই ভাসানোর চেষ্টা করেছে— 'বাংলা ভাগ হতে দেবো না।' শাসকরা এই ভাষাতে কথা বলে, মানুষের মুখ দিয়ে এই ভাষাই বলাতে চায়। শাসকরা, মালিকরা, পুঁজিপতিরা আতংকিত হয়, পাছে পাহাড়ের বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদ, ট্যুরিজম সহ ব্যাপক ব্যবসা কিংবা ওখানকার বাজার বেহাত না হয়ে যায়। আর মানুষের মুখে তারা যতসব ছেঁদো যুক্তিগুলো বসায়— 'আমরা কেন ছেড়ে দেবো?' কিংবা 'আমাদের একটা পাহাড় থাকবে না?' যেন পাহাড়ের মানুষগুলি প্রাণহীন কাঠের পুতুল, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-চাহিদা বলে কিছু থাকতে পারে না। অতঃপর শাসকরা যা বলবে, সমতলের কেষ্টবিষ্টুরা যা বলবে সে পথেই চলতে হবে পাহাড়কে। হুজুর, অপরাধ নেবেন না, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের পরবর্তী বাংলায় কিন্তু এই প্রশ্নহীন আনুগত্য নেই, নেই শ্মশানের শান্তিও। আমরা এখন চা বাগানের দীর্ঘ বঞ্চনার কথা জানি, আমরা সিঙ্কোনা চাষের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত সরকারি নীতির কথা জানি, আমরা জানি কিভাবে রাজ্য সরকার— সুবাস ঘিসিং চক্র বিশ বছর ধরে দুর্নীতি আর স্বজনপোষণ চালিয়েছে, আমরা জানি যে শতকের পর শতক ধরে একটা জাতিকে বাহাদুর বাহাদুর বলে ডেকে চলা যায় না, আমরা জানি যে ওদেরই ভাই-বোন-বন্ধুরা পাশের দেশ নেপালে আড়াইশো বছরের রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করেছে। অতঃপর, শাসকরা বুঝে কথা বলুন।

নিম্নদামোদর অঞ্চলে বছর বছর বন্যার জন্য দায়ী কে?

অজয় বেরা

(গত সংখ্যার পর)

নিম্ন-দামোদর এলাকা

ভৌগোলিক দিক থেকে নিম্ন-দামোদর এলাকা বলতে বোঝায় বর্ধমান শহরের দক্ষিণ দিক অর্থাৎ বর্ধমান জেলার কালনা জামালপুর, বাঁকুড়ার সোনাখালি, হুগলীর আরামবাগ গোঘাট, খানাকুল, পুরশুড়া, উদয় নারায়ণপুর (হাওড়া জেলা) মহকুমার চারটি থানা, মেদিনীপুরের ঘাটাল দাসপুর থানা-এলাকা, ছাড়াও ডায়মন্ডহারবাড় পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা। যদিও সোনাখালিকে এখন নিম্নদামোদরের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয় না। এই এলাকায় কমপক্ষে পঞ্চাশ-ষাট লক্ষ মানুষের বসবাস।

এই এলাকায় বন্যা সমস্যার উৎপত্তির কারণ

এই নিম্ন-দামোদর এলাকার উত্তর-পূর্বাংশ দিয়ে বয়ে এসেছে দামোদর নদ, এই নদ বর্ধমানের দক্ষিণাংশে জামালপুরে দ্বিখণ্ডিত হয়ে দামোদর ও মুণ্ডেশ্বরী নামে পরিচিত হয়েছে। দামোদরের মূল প্রবাহ বর্তমানে মুণ্ডেশ্বরী দিয়ে প্রবাহিত। এই এলাকার উত্তর পশ্চিমমাংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে শীলাবতী নদী যা কংসাবতীর শাখা হিসাবেও পরিচিত। এই দুটি নদীর পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে দ্বারকেশ্বর নদ। এই তিনটি নদীর উৎপত্তিস্থল বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল। দামোদর এবং দ্বারকেশ্বর এই দুটি নদী হুগলী জেলার খানাকুল থানার বন্দর পয়েন্টে মিলিত হয়ে রূপনারায়ণ নামে পরিচিত হয়েছে। দামোদরের মূলপ্রবাহ মুণ্ডেশ্বরী, বন্দর থেকে ৮-১০ কিমি দূরে খানাকুল থানার পানশিউলী সংগমে মিলিত হয়েছে। মূল দামোদর নদ, রূপনারায়ণে মিলিত হয়েছে বাক্সীর নীচে উলুঘাটা নামক স্থানে। অর্থাৎ এই তিনটি নদীরই সমূহ জল এবং এই এলাকার বৃষ্টিপাতের জলও বহন করতে হয় বন্দর পয়েন্ট থেকে ডায়মন্ডহারবারের হুগলী নদী পর্যন্ত রূপনারায়ণকেই। অন্য কোন বিকল্প নেই।

পুরুষানুক্রমে অতীত অভিজ্ঞতা ও বর্তমান অভিজ্ঞতাতেই দেখা যাচ্ছে ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকায় বৃষ্টিপাত হলে কম দৈর্ঘ্যসম্পন্ন দ্বারকেশ্বর নদ, প্রায় ২০ ঘণ্টা আগে রূপনারায়ণে জল পৌঁছে দেয়। অধিক দৈর্ঘ্যসম্পন্ন শীলাবতী ও দামোদর ২০ ঘণ্টা পরে যখন জল এনে রূপনারায়ণে ফেলে তখন হুগলী নদীর মুখে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয় এবং নদীর পলিকে উদ্দাম গতিতে ধুয়েমুছে নিয়ে যায়। বৃষ্টিপাতই এই নদীগুলির জলের একমাত্র উৎস। বর্ষাকাল হলেই এই উৎসমুখ সচল হয় এবং শীতকাল থেকে এই উৎসমুখ শুষ্ক হতে শুরু করে। ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকায় বৃষ্টিপাত হলেই এই তিনটি নদীতে জলপ্রবাহ দেখা যায়, এবং রূপনারায়ণে এই জল পৌঁছে যায়। বিশেষজ্ঞরা বলেন সমুদ্র মুখ থেকে রূপনারায়ণের উৎসমুখের নাব্যতা ১০০ ফুটের বেশি নয়। যদিও এই নিয়ে বিতর্ক আছে। সমুদ্রমুখ থেকে নিম্ন-দামোদরের এলাকার দৈর্ঘ্য ১৬০ কিমি এবং নিম্নদামোদরের উর্দ্ধাংশ থেকে ছোটনাগপুর পাহাড় পর্যন্ত প্রায় ২৬০ কিমি।

অতীত অভিজ্ঞতা

এদেশে ইংরেজ আসার আগে থেকেই এই নিম্ন দামোদর এলাকায় বন্যা হত, যেহেতু তিনটি নদীরই উৎসমুখ এবং মিলনের জায়গা অভিন্ন। বানের সময় তিনটি নদীরই দুকুল ছাপিয়ে পলি মিশ্রিত বানের জল কৃষিজমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হত। উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম কোথাও বাধা ছিল না। ফলে বানের বিস্তৃতি বাড়ত, পলি মাটিতে জমি উর্বরা হত। জলের উচ্চতা বাড়তে পারত না। এবং স্থায়িত্বও কম হত। তাই এই জাতীয় বন্যাকে নিম্ন দামোদরের মানুষ উৎসব হিসাবে উপভোগ করত। এই বন্যার জল পুকুর ডোবা ভরিয়ে মাছ উৎপাদনে সাহায্য করত নদীনালা ধানের জমিতেও মাছের উৎপাদন হত। পাট-পচানো, মশার আতুড় ঘরের জল ধুয়ে নিয়ে চলে যেত ফলে মশার উৎপাত কমে যেত। স্বাভাবিকভাবেই দানা খাদ্যের পরেই মাছ এখানকার মানুষের দ্বিতীয় খাদ্য হিসাবে পরিগণিত হত। এলাকার অধিবাসারা নদীতে কুলু কুলু শব্দে বানের ফেনা দেখার জন্য নদীর ধারে জড়ো হত। কোথাও কোথাও বাঁধ কাটিয়ে নিজ এলাকায় বন্যার জল প্রবেশ করাত। তবে এইসব বাঁধ ছিল চাষীদের গতর খাটানো মামুলি ধরনের এলাকা ভিত্তিক। বিশেষ উঁচুও ছিল না বিস্তৃতও ছিল না। বন্যার জল প্রভূত পরিমাণে ক্ষয়িষ্ণু পাহাড়ী পলি ও সমভূমির পলি মিশিয়ে নিম্নদামোদর এলাকার কৃষিজমিকে প্রতি বছর উর্বরা করে তুলত। ফসলের জন্য কোনও সার লাগত না। রবিফসলের জন্য জৈব কম্পোষ্ট সার যা গৃহপালিত জন্তুর মলমূত্র এবং আগাছা থেকে প্রস্তুত হত তাই ব্যবহার হত। অভিজ্ঞতালব্ধ অধিবাসীদের নিকট এটা ছিল একশভাগ সত্য। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকেই বন্যা জলের গতি প্রকৃতি দেখে বন্যার স্থিতিকাল অনুমান করতে পারত। কৃষিজমির অবস্থান অনুসারে বর্ষার ধানবীজ ও পাটবীজ নির্বাচন করত। প্রয়োজনে বন্যা জলের স্থিতিকাল ২৪০ ঘণ্টা-৩০০ ঘণ্টা ধরে যেমন রকমারি ধানবীজ ব্যবহার করা হত তেমনি বন্যা সহ্য করার জন্য রোপণ ও বপন দুই পদ্ধতিকে ব্যবহার করত। আমরা অভিজ্ঞতায় দেখেছি বপন করা মেটে ধান ৩০০ ঘণ্টা জলের নীচে থেকেও বিঘায় ১৪-১৫ মন উৎপন্ন হত। আবার হাল্কা বন্যার জন্য বেশি ফলন ‘ঝিঙেশাল’ ধানের চাষ হত। খুব নীচু জমিতে ফসল নষ্টের সম্ভাবনাকে সামনে রেখে উঁচু জমিতে নাবি জাতের কালিন্দি ধানের বীজ বপন করে রাখত এবং বন্যা শেষে এই ধান রোপন করে ৬০ দিনেই ভালো ফসল হত। এই বীজতলাগুলি প্রয়োজন না হলে গোখাদ্য হিসাবে ব্যবহার হত। এই বন্যার সঙ্গে লড়াই করে এনিয়ে চলার স্বাভাবিক দক্ষতা মানুষ অর্জন করেছিল। গৃহপালিত পশুজন্তুরাও সাঁতারে বন্যার নদী পাড় হতে পারত। জীবন জীবিকার সুবিধার জন্য এই এলাকা ছিল দক্ষিণবঙ্গের ঘনবসতি এলাকা। ১৯৪৭ সালের আগে পাকারাস্তাঘাট ছিল না বললেই চলে, স্থলযান বলতে গরুর গাড়ি মোষের গাড়ি এবং পালকি ছিল ভরসা। তাই মানুষ জলপথকেই পরিবহন ও যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম করে তুলেছিল। উক্ত প্রধান চারটি নদী এবং অসংখ্য কাটা খাল (কানানদী) খালগুলিতে অজস্র পালতোলা নৌকা-শালতি-বজরা-ডিঙ্গি-ভাউলে ইত্যাদি নৌযান চলাচল করত। এক-একটা নৌকা বজরা চল্লিশ-পঞ্চাশ টন মাল বহন করতে পারত। ইংরেজরা আসার পর থেকে কিছু যন্ত্রচালিত নৌকা (স্টিমার) চালু করে। এই জলযানগুলিতে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান হত। খুব কম খরচে মাল পরিবহন হত। তেমনি এই শিল্পটি নির্মাণ কাজও রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য অসংখ্য পেশাদারী শিল্পী (মিস্ত্রী) তৈরি হত। নদীর তীরবর্তী স্থানে অসংখ্য ব্যবসাগঞ্জ বা বন্দর গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে এই এলাকায় স্থল পরিবহন যতই উন্নত হোক না কেন নদীপথ ধ্বংস না হয়ে গেলে আজও জলপরিবহন জল পরিবহনকে সহজেই চ্যালেঞ্জ জানাতে পারত। কারণ স্থলপরিবহন অপেক্ষা স্থল পরিবহনের খরচ অনেক কম।

বর্তমান অবস্থা

ইংরেজ সরকার উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে স্থাপনের পরে বন্যার হাত থেকে রেল-লাইন বাঁচানোর জন্য দামোদরের উত্তর-পূর্ব পাড় এবং রূপনারায়ণের দক্ষিণ-পূর্ব পাড় বাঁধ দেওয়ার কাজ শুরু করে আগেই উল্লেখিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে শাসন-শোষণকে পাকাপোক্ত করার জন্য সরকারের বিদ্যুৎ ঘাটতি অনুভূত হয়। সরকারি প্রয়োজন মেটাতে বড়লাট ওয়াভেল সাহেব দামোদরে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আমেরিকা থেকে টেকনিশিয়ান নিয়ে আসেন। তখন ইংরেজ আমেরিকা গলায়-গলায় ভাব। ওয়াভেল সাহেবের বিদ্যুৎ চাই, আমেরিকারও প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি বিক্রির পয়সা চাই, দামোদর নদীতে ক্রশ বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ তৈরির পরিকল্পনায় আমেরিকার টেনেসি নদীর পরিকল্পনাকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এই অনুকরণ ছিল অন্ধ অনুকরণ। টেনেসি নদীর এবং দামোদর নদীর উপত্যকার বাস্তব অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। টেনেসির নিম্ন অববাহিকায় জনবসতি ছিল না বললেই চলে। অথচ দামোদর নিম্নাঞ্চলে ঘন বসতির প্রাবল্য। শুধু তাই নয় নদীর জলকে কেন্দ্র করে চাষবাষ পরিবহন জীবনজীবিকা টেনেসির নিম্ন উপত্যকায় ছিল না। টেনিস নদীর পরিকল্পনা মূলত সেচ কাজের জন্যই করা হয়েছিল। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায়ে বন্যা প্রতিরোধের কোন বিষয় ছিল না, তাই নিম্ন টেনিসি উপত্যকায় বন্যা এখনও হয় কিন্তু জনবসতিহীন বলে জনজীবনে গুরুতর কোনও ছাপ ফেলে না।

নিম্ন-দামোদর এলাকায় প্রচুর ঘনবসতি এবং উর্বরা শক্তিসম্পন্ন পলিমাটি গোটা রাজ্যের তিরিশ ভাগ শষ্য উৎপন্ন করে। তাই স্বাধীনতার প্রাককালে দামোদর পরিকল্পনার বিশেষজ্ঞ এবং জনগণ উভয় দিক থেকেই বিরোধিতা হয়েছিল, যদিও সেই আন্দোলন সংগঠিত রূপ পায়নি। এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করলে বন্যার প্রাদুর্ভাব ভয়ঙ্কর রূপ নেবে। নিম্নদামোদর এলাকায় বিশাল জনসমষ্টি জীবনজীবিকার বিশাল সংকটে পড়বে, কলকাতা-বন্দর বন্ধ হয়ে যাবে বলে স্বাধীন সরকারকে পর-পর সতর্ক করা হয়। মানুষের এই বিরোধিতার প্রত্যুত্তরে সরকার ঘোষণা করেছিল বন্যার বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং কলকাতা বন্দরকে বাঁচানোর জন্য ফারাক্কা থেকে অতিরিক্ত জল আনা হবে। বাস্তবে দেখা গেল দামোদর পরিকল্পনার ফলে দুর্গাপুরে একটি শিল্প নগরী গড়ে উঠল এবং বর্ধমানের কিছু অংশে সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটল। নিম্নদামোদর এলাকায় সেচ ব্যবস্থায় যেমন মার খেল তেমনি বন্যার ভয়ঙ্করতা বৃদ্ধি পেল। কানা-নদীসহ-রূপনারায়ণ মজতে শুরু করল। জোয়ার-ভাঁটার পলি পরিষ্কার করার জন্য যথেষ্ট জলের জোগান বন্ধ হয়ে গেল। ডায়মন্ডহারবার থেকে হুগলী নদীর নিম্নাংশে পলি জমতে শুরু করল। ফারাক্কা থেকে হুগলীর নিম্নাংশের দূরত্ব এত বেশি যে সেখানে পলি ঠেলবার মতো কোন ক্ষমতা থাকে না। ফলে ফারাক্কা থেকে বয়ে আসা পলি কলকাতার উত্তর অংশে গঙ্গানদীতে অনেক চড় ও দ্বীপের সৃষ্টি করল। হুগলী নদীর নিম্নাংশ একইভাবে মজতে মজতে অনেক দ্বীপের যেমন সৃষ্টি করল তেমনি জলযান পরিবহনে অনুপযোগী হয়ে উঠল। বর্তমানে কলকাতা বন্দরে কোন বড় কিংবা মাঝারি জাহাজ প্রবেশ করতে পারছে না। সরকার বেকায়দা দেখে কলকাতা বন্দরের বিকল্প হিসাবে কোটি কোটি বিদেশি মুদ্রা খরচ করে হলদিয়া বন্দর তৈরি করল। কংসাবতী পরিকল্পনার কল্যাণে হলদিয়া বন্দরেরও বর্তমান কলকাতা বন্দরের অনুরূপ অচল অবস্থা তৈরি হচ্ছে। বর্তমান রাজ্য সরকার বেকায়দায় পড়ে এবারে মাঝসমুদ্রে বন্দর গড়ার উদ্ভট পরিকল্পনায় মেতেছে।

অন্যদিকে সমগ্র রূপনারায়ণ নদী পলি ভরাট হয়ে ছোট ছোট নৌকা বজরা প্রকৃত চলাচলের একেবারে অনুপোযোগী হয়ে গেছে। দামোদর দ্বারকেশ্বর শীলাবতী কানা নদীর রূপ পরিগ্রহ করে আসল কানা নদীগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। তাই বর্তমানে এই এলাকায় জলযান যেমন স্তব্ধ তেমনি বর্ষার জল বের হতে না পেরে চারমাস যাবৎ স্থায়ী বন্যা সৃষ্টি করে রেখেছে। তাই বর্ষাকালে যখনই দ্বারকেশ্বর শিলাবতীতে কিছু জল আসে কিংবা দামোদর থেকে বাড়তি জল কিছু ছাড়া হয়, তখনই ৪০-৫০ লক্ষ মানুষের ত্রাহি ত্রাহি রব ওঠে। রূপনারায়ণ নদী অনেক জায়গাতেই কৃষিজমি অপেক্ষা ৮-১০ ফুট উঁচু হয়ে গেছে। সামান্য জলেই স্ট্যাগনান্ট ফ্লাড ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে। গরীব মানুষের সারা বছরের মেহনতকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই বিধ্বংসী বন্যা। ১৯৭৮ সালে ঐতিহাসিক বন্যার পড়ে আরও অন্তত ছ-টি বন্যার সম্মুখীন হয়েছে ৪০-৫০ লক্ষ মানুষ। ১৯৭৮ সালের বিধ্বংসী বন্যাকে ব্যতিক্রমী ঘটনা ধরে নিয়ে পরবর্তীকালে যারা ঘর বাড়ি বাসস্থান বন্যা লেবেলের উপরে করেছিলেন, বর্তমান অবস্থা সব হিসাবকে উলটে পালটে দিয়েছে। বিগত দুটি বন্যায় দেখা যাচ্ছে বন্যার জলস্তর ১৯৭৮ সালের বন্যা অপেক্ষা ৪ ফুট উঁচু হয়ে একতলা পাকাবাড়ি জলমগ্ন হয়ে যাচ্ছে। ৭৮ সালের বন্যাতে গবাদি ও ঘর-বাড়ি ভেসে যাওয়ার ফলে অনেক মানুষকেই গাছের উপরে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। বর্তমানে সেই একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। শুধু তফাৎ হল তখন পাকাবাড়ির সংখ্যা কম ছিল এখন সবগ্রামেই কিছু কিছু ২-৩ তলা পাকা বসত বাড়ি স্কুলঘর তৈরি হয়েছে। প্রতিবছরই সর্বহারা বন্যা দুর্গতদের দুবার তিনবার এই সমস্ত পাকাবাড়ির ছাদে আশ্রয় নিতে হচ্ছে। গবাদিপশু ছাগল ভেসে যাচ্ছে। সর্বস্বান্ত হয়ে আবার ভেসে যাওয়ার আশঙ্কায় গবাদি পশু চাষ উঠে যেতে বসেছে। গ্রামে দুধের যোগান বন্ধ হয়ে শহর থেকে আসা গুঁড়ো দুধ বা প্যাকেট দুধের উপর মানুষ নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। চার-পাঁচ মাস বন্যা প্লাবিত থাকার সময়ে কোন চাষবাস সম্ভব হচ্ছে না। যদিও কোন কোন চাষী বন্যার আগে থেকে পাট বা ধান চাষ করে থাকে। দূষিত বন্যার জল সেইসব ফসলকে পচিয়ে মানুষের জনজীবনকে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় নিয়ে যায়। স্থায়ী বন্যার পচা জলে মশার প্রাদুর্ভাব হাজার গুণ বৃদ্ধি পেলেও মাছের উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। দুর্গাপুরের শিল্প কারখানার বর্জ্য মিশ্রিত বিষাক্ত জল মাছের স্বাভাবিক উৎপাদনের প্রধান বাধা। উপরন্তু কৃষিতে কীটনাশক প্রয়োগের ফলে মাছের স্বাভাবিক উৎপাদন একেবারে বন্ধ। বন্যার পরে যেটুকু কৃষিকাজ হয় তাতে স্বাভাবিক আমন বা বোরো ধানের চাষ সম্ভব হয় না। উচ্চফলনশীল চাষ করার অর্থই হচ্ছে জমিতে অত্যধিক পরিমাণ রাসায়নিক সার কীটনাশক প্রয়োগ।

রাজ্যে মৎসমন্ত্রী আছে। তার হাঁকডাক গলাবাজি আছে, কিন্তু মাছের উৎপাদন নাই। অন্ধ্র-তামিলনাড়ু থেকে বরফ দেওয়া বাসি মাছ এলে কিছু মানুষ কিনতে পারে কিন্তু গরীব মানুষের কাছে মাছ এখানে দুর্লভ বস্তুতে পরিণত হয়েছে। জলযান পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত, মাছচাষের সঙ্গে যুক্ত লক্ষ-লক্ষ মানুষ বেকার হয়ে দারিদ্র্য সীমার তলানিতে হাজির হয়েছে। এইসব বাড়ির ছেলেপুলেগুলি বিগত ৪০ বৎসর যাবৎ স্বভূমে পরবাসী হয়ে নিরন্ন অবস্থায় কপাল চাপড়েছে। তারা আজ প্রৌঢ়। তাদের বাড়ির ছেলেপুলেগুলি না খেয়ে মরতে বা কপাল চাপড়াতে রাজি হয়নি তাই তারা প্রাথমিক পর্যন্ত নাম সই শিখে পেটের তাগিদে বাইরে যেতে শুরু করল। বর্তমানে ঘাটাল মহকুমা, আরামবাগ মহকুমা ও হাওড়া জেলার এই নিম্নাংশে কয়েক লক্ষ যুবক দিল্লী, বোম্বাই মীরাট, সুরাট প্রভৃতি এলাকায় হাতের কাজে দিনমজুরে পরিণত হয়ে ছোটাছুটি করছে, এরা দামোদর পরিকল্পনার কল্যাণে একেবারেই নিঃস্ব সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত। বাইরের জগৎ থেকে এদের ছেলেপুলেরা টাকা-পয়সা না পাঠাতে পারলে না খেয়ে মরতে হবে।

রাজ্যের সরকার দারিদ্র্য দূরিকরণের জন্য নিরক্ষরতা বিলোপের জন্য প্রাণত্যাগ ছাড়া প্রাণপাত পরিশ্রম করে যাচ্ছে বলে ঘোষণা, নিম্ন-দামোদর এলাকার এই লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য পরিবার কৈশোর, যৌবন হারিয়ে পরিবার বাঁচাতে এইড্স্ নামক মারনব্যাধি নিয়ে জীবন দিতে বাধ্য হচ্ছে, কার অপরাধে? স্বভূমে পরবাসী হয়ে, লক্ষ লক্ষ পরিবারকে কেন তাদের অপ্রাপ্ত বয়সের ছেলেদের লেখাপড়া খেলাধূলা বাদ দিয়ে পেটের দায়ে বিদেশে পাঠাতে হচ্ছে। একটাই উত্তর দামোদর পরিকল্পনার কল্যাণে।

সরকার ভ্রান্ত পরিকল্পনার পিছনে কোটি কোটি বিদেশী মুদ্রা খরচ করছে। সেই পরিকল্পনার সুফল কিছুমাত্র ভোগ করছে নিশ্চয়, কিন্তু কুফল ভোগকারীদের জন্য বিকল্প পরিকল্পনা হবে না কেন? যারা তাড়িঘড়ি এই ভ্রান্ত পরিকল্পনাকে কার্যকরী করেছিল, মূলতঃ তাদের ঘাড়েই লক্ষ লক্ষ সর্বহারা মানুষকে বাঁচানোর দায়িত্ব এসে পড়ে। এই পরিকল্পনা যে ভ্রান্ত ছিল, দেশীয় বিশেষজ্ঞদের সতর্কবার্তা যে সঠিক ছিল বিগত পঞ্চাশ বছরে তা প্রমাণিত হয়ে গেছে, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা যে ভ্রান্ত ছিল সেকথা সবাই বুঝলেও সরকার বোঝেনি। জলবিদ্যুৎ খরস্রোতা নদীতেই সম্ভব। সমতলের নদীতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচে ঢাকের দায় মনসা বিকিয়ে যাবে। তাই নামমাত্র জলবিদ্যুৎ উৎপাদনেই এই পরিকল্পনাকে সীমিত রাখতে হয়েছে। সেচের এলাকা বাড়েনি। নিম্নদামোদরের এলাকাকে বঞ্চিত করে বর্ধমানের এবং নামমাত্র বাঁকুড়া হুগলীর অংশে (যা নিম্নদামোদরের মধ্যে পড়ে না) সেচ হচ্ছে। তৃতীয়ত, বন্যা প্রতিরোধের নামে বন্যার বিভৎসতা অনেকগুণ বেড়ে গেছে। নিম্নদামোদরে ক্ষতি হয়েছে (ক) নদীনালাগুলি মজে গেছে। (খ) জলপথে পরিবহন বন্ধ হয়ে গেছে। (গ) চাষের জমি উর্বরাশক্তি হারিয়ে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ঔষধের উপর নির্ভরশীল হয়েছে। (ঘ) মাছের উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। (ঙ) গবাদি চাষও প্রায় উঠে যাওয়ার উপক্রম (চ) প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমেছে—মারন রোগে আক্রান্তের সংখ্যাবৃদ্ধি (ছ) বন্যা ভয়ংকর বিভিষীকা সৃষ্টি করেছে (জ) কলকাতা বন্দরকে প্রায় অচল করে দিয়েছে।

এই অসহনীয় অবস্থা থেকে পরিত্রানের রাস্তা কোন্‌টি? বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি ছয়দশক থেকে ভ্রান্ত পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রচার সংগঠিত করেছিল। সাতের দশকে সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের সেচমন্ত্রী গণিখাঁন চৌধুরীর প্রকল্পিত দামোদরের পাড় বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধিতা করে এবং তারা ক্ষমতায় এলে নিম্নদামোদর সমস্যার সমাধান করবে বলে জনগণকে প্রতিশ্রুতি দেয়। সিপিএমের নিম্নদামোদর এলাকায় সংগঠিত শক্তির বাড়বাড়ন্ত এই বন্যাবিরোধী আন্দোলনকে সামনে রেখে তাই ১৯৭৭ সালে রাজ্যে বাম সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই সেচমন্ত্রী প্রভাস রায়ের উদ্যোগে তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। হাওড়া-হুগলী-মেদিনীপুর বর্ধমানের কৃষক নেতা এবং রাজ্য প্রযুক্তিবিদদের নিয়ে ১৯৮১ সালে নিম্নদামোদর পরিকল্পনা নামে যে পরিকল্পনা কেন্দ্রিয় সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হলো তার মূলকথা ছিল (ক) বন্যার ভয়ঙ্করতা কমানো (২) বন্যাজনিত দুঃখকে ভাগাভাগি করে নেওয়া।

এই পরিকল্পনার তিনটি অংশ ছিল (ক) সমস্ত মজে যাওয়া কাটাখাল (কানানদী) গুলির সংস্কার (খ) জমা জল দ্রুত নিষ্কাসনের জন্য কিছু নূতনখালের প্রস্তাব (গ) রূপনারায়ণ নদীকে নিরন্তর ড্রেজিংয়ের আওতায় নিয়ে এসে পুরাতন নাব্যতায় ফিরিয়ে আনা। এই প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় বিশেষজ্ঞরা জানালেন বন্যার জমা জল দ্রুত রূপনারায়ণ দিয়ে সমুদ্রে পাঠাতে পারলেই বন্যার প্রাদুর্ভাব বিভীষিকার হাত থেকে এই এলাকার মানুষকে রক্ষা করা সম্ভব। ৫ বছর বাদে এই প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়ে ফিরে আসার পরে দুটি দশক বামফ্রন্ট সরকার নিশ্চুপে কাটিয়ে দিল।

প্রতিবছর বন্যা হয় আর ক্যাডার বাহিনীর চিড়েগুড়ের উৎসব লেগে যায়। গৃহঅনুদানের টাকায় পরবর্তী নির্বাচন যেমন চালিয়ে দেওয়া যায় তেমনই ফুরফুরে হাওয়ায় বেশকিছু কমরেডের রংও বদলে যায়। জনগন যে তিমিরে ছিল সেখানেই থেকে যায়। শুধু কপালের দোষ দেয় আর ভগবানকে ডাকে। বন্যার প্রকোপ ও বন্যাজনিত দুর্দশা বাড়তেই থাকে।

এখানে স্পষ্ট করেই বলা দরকার পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এবং সিপিএম নামক রাজনৈতিক দলটি নিম্নদামোদরের জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। মসনদে আসীন হয়ে জনগণের উপরে দল ও সরকারকে স্থাপন করেছে। প্রয়োজনে স্মৃতিবিভ্রম ঘটিয়ে দেওয়া প্রতিশ্রুতি সহজেই ভুলে যেতে পারে। আবার প্রয়োজনে বিস্মৃতপ্রায় ছয়এর দশকের খাদ্যসংকটের স্মৃতি জাগরুক করে ভোটবাক্স ভর্তি করার কৌশল প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু ইতিহাস বড়ই নিষ্ঠুর। বিশ্বাসঘাতকদের তা ক্ষমা করে না। তাই আজ নিম্নদামোদরের ৪০ লক্ষাধিক মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট সরকার ইতিহাসের কাঠগড়ায় আসামী। জবাব তাদের দিতেই হবে। আজ না হয় কাল। চালাকি কিছুকাল চলে—চিরকাল চলে না।

(লেখক ১৯৬৭ সাল থেকে আরামবাগ অঞ্চলে সিপিএম পার্টির নেতৃত্বকারী সংগঠক। জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। পার্টির কাজকর্মে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ১৯৯৮ সালে দল ছেড়ে ‘গণতান্ত্রিক মঞ্চ’ নামে নতুন সংগঠন গড়ে তোলেন।)

পঞ্চায়েত থেকে পুরসভা—ভোটাররা পরিবর্তনমুখী

অমৃত পৈড়া

এই মুহূর্তে পশ্চিমবাংলায় সিপিএম-বিরোধী হাওয়া বেশ প্রবল। পঞ্চায়েতের পর কয়েকটি পুরসভা নির্বাচনের ফলাফলেও সে কথা স্পষ্ট। পঞ্চায়েতের মোট ৩২২০টি আসনের মধ্যে সিপিএম ও তার সঙ্গীরা ১৬৩৫টি আসনে পরাজিত হয়। পুরসভায় ফলাফল আরও শোচনীয়। এবারে মোট ১৩টি পুরসভায় নির্বাচন হয়েছিল তার মধ্যে বামফ্রন্ট পেয়েছে ৫টি, বিরোধীরা পেয়েছে ৮টি। বামফ্রন্টের ৫টির মধ্যে ১টি ফঃবঃ এবং ১টি আরএসপি। ফঃবঃ-আরএসপি-র সঙ্গে সিপিএম-এর যা সম্পর্ক তাতে বামফ্রন্টের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠে গেছে। বিরোধীদের চেয়েও আরএসপি, ফঃবঃ-র সঙ্গে সিপিএম-এর খুনোখুনি হচ্ছে বেশি। বাসন্তী, দিনহাটার ঘটনা খুব পুরনো কোন বিষয় নয়। পুরসভা নির্বাচনেও মেখলিগঞ্জে সেরকমই ঘটনা ঘটেছে। সিপিএম-এর সঙ্গে ফঃবঃ-র সরাসরি লড়াই হয়েছিল, ৯টি আসনের ৫টিতে ফঃবঃ-র প্রার্থী ছিল, চারটিতে সিপিএম এর। ফঃবঃ-র আসনগুলিতে সিপিএম গোঁজ প্রার্থী দিয়েছিল আবার সিপিএম-এর আসনগুলিতে ফঃবঃ গোঁজ প্রার্থী দিয়েছিল। ফঃবঃ-র ৫ প্রার্থী এবং ৪ গোঁজ প্রার্থীই বিজয়ী হয়েছে। সব মিলিয়ে পুরসভা নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে সিপিএম-এর অবস্থা বেশ খারাপ। পঞ্চায়েত থেকে পুরসভা সমস্ত নির্বাচনে মানুষ সিপিএম বিরোধী প্রার্থী, যে যেখানে শক্তিশালী, তাকেই ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন। সিপিএম-এর সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে জোর করে কৃষকদের জমি কেড়ে নেওয়া, হার্মাদ বাহিনী দিয়ে সমস্ত প্রতিবাদী কণ্ঠ রোধ করার চেষ্টা করা এসব পশ্চিমবাংলার মানুষ মেনে নেয়নি। নন্দীগ্রামে দ্বিতীয় গণহত্যার পর কলকাতার ঐতিহাসিক মিছিলে মানুষের ঢল দেখেই একথা বোঝা গিয়েছিল। শুধু সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের গ্রামবাসীরাই নন সারা পশ্চিমবাংলার মানুষই যে সিপিএম প্রস্তাবিত এই উন্নয়নের মডেলটিকে মানছেন না বা সিপিএম-এর এই সীমাহীন ঔদ্ধত্য মানছেন না এটা নানান ঘটনায় বোঝা যাচ্ছিল। পঞ্চায়েত ও পুরসভা নির্বাচনেও মানুষের সেই মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘোলা জলে মাছ ধরছে কংগ্রেস। জমি অধিগ্রহণ, সেজ, খুচরো ব্যবসায় বহুজাতিকদের নিয়ে আসা থেকে শুরু করে বিশ্বায়নের যাবতীয় কর্মসূচীর রূপকার হয়েও এরা পশ্চিমবাংলার বিরোধী জোটের হাওয়া তুলে তৃণমূলকংগ্রেসের সঙ্গে কোথাও কোথাও এমনকি বিজেপি-র সাথেও জোট বেঁধে মানুষের ভোট কুড়োচ্ছে। পুরসভা থেকে পঞ্চায়েত সর্বত্র ক্ষমতার অংশীদার হচ্ছে। মালিকশ্রেণীর প্রধান দল কংগ্রেসের রাজনৈতিক স্বরূপ উন্মোচন করার মতো শক্তিশালী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এ রাজ্যে অনুপস্থিত থাকার কারণেই কংগ্রেস তার ফয়দা লুটছে।

বস্তুতঃ পশ্চিমবাংলায় সংগ্রামী বামপন্থী দলগুলির দুর্বলতার কারণেই মালিকশ্রেণীর দলগুলি এখনও মানুষের সমর্থন তাদের ভোটবাক্সে ঢোকাতে পারছে। কোন সঠিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, পুঁজিবাদবিরোধী বামপন্থী রাজনৈতিক বিকল্প আজ মানুষের সামনে উপস্থিত নেই। এরাজ্যের বৃহত্তম বামপন্থী দল সিপিএম একটি ঘৃণ্য পুঁজিবাদী দলে পরিণত হয়েছে। বামফ্রন্টের অন্যান্য দলগুলি নীতিহীন, মেরুদণ্ডহীন, ক্ষমতার উচ্ছিষ্টভোগী। এমন সময়ে অন্যান্য সংগ্রামী বামপন্থী দলগুলির কেউ কেউ একটি প্রকৃত বামপন্থী বিকল্প গড়ে তোলার পরিবর্তে শাসকশ্রেণীরই কোন না কোন দলের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় ব্যস্ত।

সাধারণ মানুষ নিরূপায় হয়ে যেখানে যে দলকে শক্তিশালী বিরোধী মনে করছেন সিপিএম-এর বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে জয়ী করছেন। এতে একটা জিনিস স্পষ্ট পশ্চিমবাংলার মানুষ আজ পরিবর্তনমুখী। কিন্তু এই পরিবর্তন কোন নীতিগত পরিবর্তন আনতে পারবে না যদি না বিকল্প বামপন্থী রাজনীতি জোরেসোরে সমাজে হাজির হয়। এরফলে নতুন শাসকরা যখন ক্ষমতায় এসে সেই একই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের নীতি প্রণয়ন করবে তখন আবার নতুন করে মানুষের মনে হতাশা তৈরি হবে। একটি বিকল্প বামপন্থী শক্তির উত্থানের এখনই উপযুক্ত সময়— পঞ্চায়েত থেকে পুরসভা নির্বাচনের ফলাফল সেই সত্যকেই আমাদের সামনে তুলে ধরছে।

ব্যারাকপুর নোনাচন্দনপুকুরে বাজার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ ব্যারাকপুরের নোনাচন্দনপুকুর এলাকার সুপ্রাচীন বাজার তুলে দিয়ে বহুতল তৈরী ও বাজারের দোকানদার ও চাষীদের রুটি-রুজি থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও তীব্রতর হচ্ছে। গত ২৯ শে জুলাই বাজার এলাকা সংলগ্ন ব্যারাকপুর-বারাসাত রোড দুপুর ১২টা-১টা পর্যন্ত অবরোধের কর্মসূচী নেয় বাজার সমিতি। এই অবরোধ কর্মসূচীতে অংশ নেন এলাকার ছোট ব্যবসায়ীরা ছাড়াও অঞ্চলের সাধারণ মানুষ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে এখানকার বাজারটিকে ব্যারাকপুর পৌরসভার সিপিএম বোর্ডের নির্দেশে বুলডোজার দিয়ে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। মারাত্মক সেই হামলায় সমস্ত দোকান, শেড যেমন ধুলিসাৎ হয়, তেমনই আহত-রক্তাক্ত হন বহু মানুষ। এর ফলে ওখানকার ৫০০ ব্যবসায়ী-দোকানদার এবং কৃষকরা, যারা সংলগ্ন গ্রামাঞ্চল থেকে শাক-সবজি নিয়ে বাজারে আসতেন, তাঁরা আচমকাই জীবিকাচ্যুত হন। পুরসভার পক্ষ থেকে বলা হয় যে ওখানে তেরোতলা একটি বহুতল করা হবে, এবং ৫০০ জনের মধ্যে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ৩৩০ জনের বন্দোবস্ত করা হবে। যদিও তার জন্য যে দাম দোকানদারদের দিতে হবে, তা অধিকাংশেরই সাধ্যের বাইরে। তাছাড়া, এ সমস্ত বক্তব্য মৌখিকভাবেই এসেছে মাত্র, লিখিত কোন প্রতিশ্রুতি মেলেনি পুরসভার তরফে। এর প্রতিবাদে বাজার সমিতির নেতৃত্বে লড়াই বিগত গোটা পর্যায়টা জুড়ে চলেছে। ইদানীং যখন বিভিন্ন জায়গায় খুচরো ব্যবসায়ীদের ওপর আক্রমণ নামছে, সরকার দেশী-বিদেশী বৃহৎ পুঁজিকে ঢালাও ছাড়পত্র দিচ্ছে খুচরো ব্যবসায় বিনিয়োগ করার জন্য, শপিং মল-বিগবাজার গড়ে উঠছে অনবরত, তখন এখানকার পৌরসভার মতলবটাও পরিষ্কার। এখানেও শোনা যাচ্ছে বাজারটিকে তুলে দেওয়া হবে পিয়ারলেসের হাতে, মুনাফা লুটবে বৃহৎ পুঁজিপতিরা, পথে বসবেন ছোট ব্যবসায়ী, কৃষক আর সমাজের আরও নানা অংশের মানুষ। নোনাচন্দনপুকুর বাজার ব্যবসায়ী বাঁচাও কমিটির সম্পাদক সুনীল ঘোষ বলেন যে, "পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের প্রতিষ্ঠিত ৬০ বছরের পুরনো বাজারের ব্যবসায়ীরা শুধু সমতলটা দাবী করেছে, যার জন্য তারা বাজার কেনার সময়ে ২৫ শতাংশ টাকাও দিয়েছে। ইতিমধ্যে পৌরসভা ১৩ তলা বাণিজ্যকেন্দ্র ও আবাসন নির্মাণের দরপত্র আহ্বান করেছে। অথচ বাজারের ব্যবসায়ীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে।

পুঁজির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

শ্রীরামপুর, ব্যারাকপুর, গড়িয়াহাট, পাণিহাটি সহ বিভিন্ন অঞ্চলের ছোট ব্যবসায়ীরা। আন্দোলনে সামিল হয়েছে ছোট ব্যবসায়ীদের সংগঠন এফটিও।

এই পরিস্থিতিতে বিগত কয়েকমাস ধরে যে একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চ তৈরীর প্রচেষ্টা চলছিল, তার আত্মপ্রকাশ ঘটলো গত ২৬শে জুলাই শিয়ালদা নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটে এক কনভেনশনের মধ্যে দিয়ে। এই কনভেনশনে একদিকে যেমন উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মীরা, বিভিন্ন অঞ্চলের ছোট ব্যবসায়ীরা, তেমনই ছিলেন মহাশ্বেতা দেবী, প্রতুল মুখোপাধ্যায়রাও। এই কনভেনশন থেকে একটি প্রতিনিধি পরিষদ ও একটি উপদেষ্টামন্ডলী নির্বাচিত হয়। নভেম্বরে রাজ্যপালের কাছে এক লক্ষ সম্বলিত স্মারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচী ঘোষিত হয়।

বন্যার কবলে পটাশপুর

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ নরঘাট ব্রিজ পেরিয়ে দীঘাগামী রাস্তা ধরে গাড়ি যখন কালিনগর বাজার থেকে ডান দিকের পটাশপুর যাওয়ার রাস্তা ধরল তখনও বন্যার চিহ্ন নজরে এল না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার এই রাস্তা ধরে কিছুটা এগোতেই অন্য ছবি ফুটে উঠল। রাস্তায় দু'ধার সারি সারি পলিথিন, ত্রিপল দিয়ে ছাওয়া ছোট ছোট ছাউনিতে গাদাগাদি করে বাচ্চা-বুড়ো, ছেলে-মেয়ে, গরু-ছাগল মাথা গুঁজে রয়েছে। তারই মধ্যে অসুস্থ, অন্তঃসত্ত্বারা। উঁচু এই পিচ ঢালা রাস্তার দু'ধারে যতদূর চোখ যায় শুধু জল। আধ ডোবা গাছ, ভেঙে পড়া বাড়ি মাঝে মাঝে জেগে রয়েছে। গাড়ি যত এগিয়েছে আরগোয়ালের দিকে ততই ছাউনির ঘনত্ব বেড়েছে। রাস্তায় জটলা পুরুষদের, ছাউনির থেকে উদ্বেগ জড়ানো মহিলাদের বাড়ানো মুখ দেখে বোঝা যায় যে মানুষগুলি বিপদের মধ্যে রয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর দুই নং ব্লকের আরগোয়াল গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনে বসে কথা হচ্ছিল পঙ্কজ নন্দী, লক্ষ্মীকান্তদের সাথে। গ্রামের পুরুষ-মহিলা-বাচ্চারা ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল আমাদের রিলিফ ক্যাম্পে; চিকিৎসা, জামা-কাপড়, খাবার পাবার আশায়। পঙ্কজবাবুরা বললেন, ঝাড়খণ্ড রাজ্যের জল, ডিভিসি-এর ছাড়া জলেই আমরা আজ সব হারিয়ে পথে বসেছি। পটাশপুর (২)-এর আরগোয়াল, সাউথখণ্ড, মথুরা অঞ্চলের ১৩-১৪ হাজার পরিবার (অর্থাৎ ৫০-৬০ হাজার মানুষ) এই বন্যায় দারুণভাবে আক্রান্ত। তাঁদের কথা অনুযায়ী, শতকরা ৯৫ ভাগ বাড়ি বন্যার জলে ধ্বংস হয়ে গেছে। কেলেখাই নদীর বাঁধ ভেঙেই এই বিপত্তি। আর এই ভরা বর্ষায় মেরামতের কাজও করা সম্ভব নয়। ফলে আগামী কমপক্ষে ২-৩ মাস জোয়ারের জল, ডভ্দ্ট্র-এর ছাড়া জল এলাকায় ঢুকতেই থাকবে। পটাশপুরের একশ বছরের ইতিহাসে এরকম আগ্রাসী বন্যা এলাকার মানুষ দেখেননি। আর এই হঠাৎ বন্যার কারণে বাড়ির কোন জিনিসপত্র এমনকি ধান-চালের সঞ্চয়ও গ্রামবাসীরা সরাতে পারেননি। মাঠভরা রোয়া আউষ ধানও চলে গেছে জলের তলায়। ঘরবাড়ি, জিনিসপত্র, ধান-চাল, মাঠের ফসল হারিয়ে এই হাজার হাজার গ্রামবাসী প্রকৃত অর্থেই আজ সর্বশান্ত। রাজ্যের মৎস মন্ত্রী কিরণময় নন্দের এই বিধানসভা কেন্দ্রে (মুগবেড়িয়া) সরকারি ত্রাণ সাহায্য নিয়ে গ্রামবাসীরা স্পষ্টতই ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। গৃহহীন এই মানুষগুলোর আশ্রয়, খাদ্য-এর মতো মৌলিক চাহিদার কোন যোগান নেই। সমসপুর, বাবুইদাঁড়ি, সন্দলপুর, আর গোয়াল, নানকা, করিমোল্লাচক, ব্রজকিসোরপুর, আয়মানচক প্রভৃতি অসংখ্য গ্রামের হাজার হাজার মানুষ আজ এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ-এর মুখোমুখি। জলে বন্দী এই মানুষগুলির চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যাও আজ ভয়াবহ। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেই কোন ডাক্তার। এলাকাতেও পাশ করা কোন ডাক্তার নেই। এক কাপড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসা এই গ্রামীণ মানুষদের জামা কাপড়ের সমস্যাও বেশ তীব্র। যুবভারত, কৃষ্টিচক্র, মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র, আয়না নাট্যগোষ্ঠী প্রভৃতি বিভিন্ন গণসংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত ত্রাণ শিবিরে ভীড় করা মানুষদের সাথে মিশে আমাদের এই উপলব্ধি। সিন্ধুতে বিন্দুর মত সীমিত ত্রাণ দিয়ে এক অতৃপ্ত মন নিয়ে আমরা বাড়ি ফেরার পথ ধরি। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি, আদিগন্ত জলে ভাসা অঞ্চল, কমে আসা দিনের আলোর মাঝে পড়ে রইল সারি সারি ছাউনি আর গরু-বাছুরের মাঝে গাদাগাদি করে থাকা মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ মানুষগুলি। এই সমস্যার কি স্থায়ী কোন সমাধান নেই? প্রশ্নটা মনকে বারে বারে খোঁচাতে থাকে।

মূল্যবৃদ্ধির নেপথ্যে

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

শক্তিশালী করার প্রয়োজন হয়। এই দাম বেঁধে দেওয়ার জন্য অবশ্যই সরকারকে ভর্তুকি দিতে হবে। ভর্তুকি প্রসঙ্গে অনেক সাধারণ মানুষও বলেন সরকার কত ভর্তুকি দেবে? সরকার গরীব মানুষের জন্য ভর্তুকি কমাচ্ছে। কিন্তু দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজিপতিদের জন্য নানা কর ছাড় দিচ্ছে। যা আসলে ভর্তুকি। শিল্প গড়ার নামে পুঁজিপতিরা লক্ষকোটি টাকা ব্যাঙ্কের টাকা আত্মসাৎ করছে। সেজ প্রকল্পের নামে বা বিভিন্ন শিল্পায়নের জন্য নানাপ্রকার কর ছাড়ের ব্যবস্থা করেছে। অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরমের কথায় শুধুমাত্র সেজ প্রকল্পের জন্য দশবছরে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা রাজস্ব হারাবে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০০৬-২০০৭ সালে কোম্পানী করছাড় বাবদ ৫০ হাজার কোটি টাকা ও উৎপাদন শুল্ক বাবদ ১ লক্ষ কোটি টাকা ছাড় দেওয়া হয়েছে। ফলে কী হয়েছে? ১০০ কোটি ডলারের (৪ হাজার কোটি টাকা) বেশি সম্পদের মালিক এমন ভারতীয়র সংখ্যা ২০০৬ সালে ছিল ২৫, ২০০৭ সালে হয়েছে ৪৮। প্রথম দশজন বিলিওনেয়ারের মোট সম্পদের পরিমাণ দাড়িয়েছে ডলার ১২ হাজার ৫৫ কোটি টাকা।

সব কৃষিতে ভর্তুকি কমানো এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলির চাপে খাদ্যশস্যের পরিবর্তে বাণিজ্যিক ফসল, উৎপাদন এবং বহুজাতিকদের বীজ, রাসায়নিক সার ব্যাপক ব্যবহারের ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমেছে। জমির উর্বরতা কমছে। কৃষিতে এই সংকটের ফলে ভয়ানক বেড়েছে মজুতদারি ও কালোবাজারির প্রথা। সুতরাং মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আজ দাবি উঠুক নিত্যব্যবহার্য জিনিষের দাম বেঁধে দাও, ১৪টি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য গণবণ্টন ব্যবস্থা শক্তিশালী করো। সম্পদশালী দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজিপতিদের সমস্ত করছাড় বাদ করো এবং তাদের সম্পদের উপর ক্রমবর্দ্ধমান হারে কর চাপা। কৃষিতে ভর্তুকি কমানো বন্ধ করো। চুক্তিচাষ, বাণিজ্যিক চাষ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। আজ আওয়াজ উঠুক মূল্যবৃদ্ধি কোন অনিবার্য পরিণতি নয়। সরকারি নীতির কুফল। এই নীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী শক্তিশালী জনমত গড়ে উঠুক। মূল্যবৃদ্ধির দায় সরকারের— মূল্যবৃদ্ধি রোধে সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে।

নেপালের বিপ্লবী সংগ্রামের সমর্থনে কলকাতায় সংহতি সমারোহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নেপালে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে অগ্রসরমান বিপ্লবী সংগ্রামে অর্জিত বিজয়গুলিকে অভিনন্দন জানাতে গত ২৩ জুন বেলা ৩টায় কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ১৪টি সংগ্রামী বামপন্থী সংগঠনের উদ্যোগে এক সংহতি সমাবেশের আয়োজন করা হয়। নেপালের মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিএন-এম)-এর প্রতিনিধি হিসাবে কমরেড লক্ষণ পন্থ এই সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। নেপালের বিপ্লবী সংগ্রাম সংহতি উদ্যোগের আহ্বায়ক সভার শুরুতে যে প্রস্তাবটি সভায় পেশ করেন তাতে বলা হয়—"নেপালের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে বিপ্লবী সংগ্রাম দীর্ঘকাল ধরে চলেছে, সেই সংগ্রামে নেপালী জনগণ বর্তমানে এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছেন। আমরা ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)-এর নেতৃত্বে সে দেশের জনগণের দ্বারা রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সহ এযাবৎ অর্জিত সমস্ত সাফল্যগুলিকে অভিনন্দন জানাই। একই সঙ্গে আমরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ভারতের সম্প্রসারণবাদী শাসকশ্রেণী ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর দ্বারা নেপালের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করছি এবং বরাবরের মতো নেপালের জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পাশে দাঁড়ানোর শপথ ঘোষণা করছি।" সন্তোষ রানা তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন, নেপালের এই বিজয় চূড়ান্ত নয়, কিন্তু যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, ভারতের সম্প্রসারণবাদী চরিত্র ও ২৫০ বছরের রাজতন্ত্রকে মোকাবিলা করেই এই বিজয় সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, নেপালের বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ধাক্কা খেয়েছে। ভারতের সংগ্রামী বামপন্থী দলগুলিও নেপালের সংগ্রামের ফলে উৎসাহিত হয়েছে বলে তিনি অভিমত রাখেন।

নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)-এর প্রতিনিধি লক্ষণ পন্থ সভায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে কমরেড প্রচণ্ড-র একটি লিখিত বার্তা পাঠ করে শোনান। কমরেড প্রচণ্ড তাঁর লিখিত বক্তব্যে জানিয়েছেন যে, "বর্তমান সময়ে যখন বিদেশী হস্তক্ষেপ ক্রমেই বেড়ে চলেছে, তখন আপনাদের সংহতিমূলক এই উদ্যোগ নেপালী জনগণের সংগ্রামকে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদী সংহতি হিসাবে সামন্তবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে নির্মূল করে একবিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে এক সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক নয়া নেপাল গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।"

সংহতি সমারোহে বক্তব্য রাখছেন সিপিএনএম-এর কমঃ লক্ষ্মণ পন্থ

লক্ষণ পন্থ তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যে বলেন— "নেপালের এই জয় কেবলমাত্র নেপালী জনগণের জয় নয়; বরং গোটা বিশ্বের বিপ্লবী জনতার জয়। নেপালের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস খুব নতুন নয়। ১৯৪৯ সালে এই কলকাতাতেই নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি জন্ম লাভ করে। জনযুদ্ধ শুরু করার আগে আমরা বহু ছোট শক্তির সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বড় পার্টি গড়ে তুলি। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ এই সময় জুড়ে আমরা প্রচার চালাই যে, সশস্ত্র জনযুদ্ধ ছাড়া জনগণের মুক্তি অর্জন করা সম্ভব নয়। সর্বসময় রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় রেখে আমরা আইনী-বেআইনী, সংসদীয়— সংসদ বহির্ভূত, নিরস্ত্র-সশস্ত্র— সব ধরণের পথকে কাজে লাগিয়েছি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ ও প্রচণ্ড পথকে সংশ্লেষ ঘটিয়ে, দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ ও দেশব্যাপী অভ্যুত্থানের মেলবন্ধন ঘটিয়ে ২০০১ সালে আমরা আমাদের পার্টির তাত্ত্বিক অবস্থান গড়ে তুলি। যারা বলে যে আমরা ভোটের পথে চলে গেছি তারা ভুল কথা প্রচার করছে। আমরা এই নির্বাচনে ক'টা সিট পেয়েছি তা গুরুত্বপূর্ণ নয়; আমরা কি রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করেছি সেটা গুরুত্বপূর্ণ। নেপালের সংগ্রামকে ঐতিহাসিক বাস্তবতায় দেখতে হবে। অনেকের কখনও মনে হয় সিপিএন(এম) সংশোধনবাদী হয়ে গেছে, আবার কখনও মনে হয় সিপিএন(এম) অতিবাম পথে চলে গেছে। আসলে নানাভাবে নেপালের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যা খবরের কাগজ পড়ে বোঝা যাবে না। দক্ষিণপন্থীরা প্রমান করার চেষ্টা করছে যে এই নির্বাচনে শান্তি ও ভোটের জিত হয়েছে। এটা আমরা খণ্ডন করি। নেপালে জনযুদ্ধ শুরু করার আগে আমরা পার্টিতে বিতর্ক করি। পার্টি সিদ্ধান্ত নেয় যে চীনের দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ আমরা অনুসরণ করব কিন্তু চীনের মডেলেই আমাদের মডেল হবে তা নয়। সামন্তবাদের সাথে আমাদের দীর্ঘদিন লড়াই চালাতে হয়েছে। কমরেড প্রচণ্ডর নামে একসময় রেড কর্ণার নোটিশ জারী করা হয়। নেপালী কংগ্রেস তো কমঃ প্রচণ্ডর মাথা নিয়ে আসার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করে দেয়। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, সামন্তবাদী শক্তি, সংশোধনবাদী শক্তিরা নেপালের বিপ্লবী শক্তিকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু পারেনি। আর এখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা চাইছে কমরেড প্রচণ্ডদের খ্রুশ্চেভের পথে নিয়ে যেতে। তার জন্য শুরু হয়েছে নানা ষড়যন্ত্র। যদিও, সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের সাগরেদ সংশোধনবাদীদের নেপালী জনগণ এই নির্বাচনে এক বিশাল থাপ্পড় কষিয়েছে। প্রচার করা হয়, রাজতন্ত্র বিরোধী সংগ্রামে নেপালী কংগ্রেসের বিরাট ভূমিকা আছে। এটা ঠিক নয়। বলা হয়েছিল কৈরালা সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে নেবে। তা হয়নি, নেপালী কংগ্রেস ও সংশোধনবাদীদের জনসাধারণ সাফ করে দিয়েছে। আমাদের সুশৃঙ্খল পার্টি, সৈনিক, শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবদের সংগঠন আছে। দশ বছরের জনযুদ্ধ না হলে ঐতিহাসিক গণআন্দোলন গড়ে উঠতো না। আবার ঐ গণআন্দোলন না হলে সংবিধান সভার নির্বাচনে এই জয় অর্জন করা সম্ভব হোত না। আর যতক্ষণ না পুরো মুক্তি অর্জিত হচ্ছে ততক্ষণ অস্ত্র ফেলে দেবার কোন প্রশ্নই নেই। রাষ্ট্রীয় একতা গড়ে আজ নতুন নেপালের নতুন সরকার গড়ে তুলতে হবে। আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন, প্রচার মাধ্যম (মিডিয়া)-এ কি বলা হচ্ছে তা দিয়ে সিপিএন(মাওবাদী)-কে বিচার করবেন না। বরং আমরা আমাদের পার্টির দলিলে কি বলছি, নিজেদের মধ্যেকার আলাপ-আলোচনায় কি বলছি তাই গুরুত্বপূর্ণ। আর তিব্বত সম্পর্কে বলতে পারি যে, আমরা জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের পক্ষে"।

চিঠিপত্র

মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সমীপেষু

মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আপনি কি জানেন কোলকাতা থেকে মাত্র কয়েক কিমি দূরে, ময়নাপুকুর বলে একটা জায়গা আছে, যার চারিধারে হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষ বসবাস করে? ঠিক ঐ জায়গাতে ১৯৭৯ সালে বামফ্রন্টের তৎকালিন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অনুমোদনে তৈরি হয়েছিল একটি স্টেট জেনারেল হসপিটাল। যার পরিকল্পনায় ছিল ১৫০ বেডের হসপিটাল হবে। এই হসপিটালের নাম গ্লস্টার স্টেট জেনারেল হসপিটাল।

১৯৯২ সালে এই হাসপাতালটি চালু হলেও আজও এই সব অঞ্চলের মানুষরা একে নিছক একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। কেন বলতে পারেন? দু'কোটি টাকা খরচ করে এই হাসপাতালের গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ হলেও চিকিৎসায় বিশেষ কিছু সুযোগ মানুষ পাচ্ছে না।

এই হাসপাতালে কি কি নেই?

(১) অপারেশনের কোন ব্যবস্থা নেই। এমনকি প্রসবকালিন সিজার-এর ব্যবস্থা নেই।
(২) জলের কোন ব্যবস্থা নেই।
(৩) স্থায়ী অ্যাম্বুলেন্স নেই।
(৪) এমারজেন্সিতে স্থায়ী ডাক্তার নেই।
(৫) এমারজেন্সি ওষুধ নেই।
(৬) সাপে কাটা ভেনাম নেই।
(৭) বিছানার কোন ব্যবস্থা নেই।
(৮) সমস্ত বিভাগের ডাক্তার নেই এবং সমস্ত বিভাগের ব্যবস্থা নেই।
(৯) জেনারেটার নেই।
(১০) রাত্রে পাহারাদার নেই।
(১১) গ্যাসের ব্যবস্থা নেই।

আরো কত কি নেই। তাই তালিকা আর বাড়ালাম না। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী পারলে একবার ঘুরে যান এই হাসপাতালটি। শুধু আপনার অপদার্থ সুপার-এর রিপোর্টের ওপর ভরসা না করে পারলে একটু স্থানীয় মানুষের সঙ্গেও কথা বলে যান।

চারিদিকে আপনারা নাকি খুব উন্নয়ন করে বেড়াচ্ছেন। মানুষ না চাইলেও জোর করে আপনারা উন্নয়ন করে ছাড়বেন। দয়া করে আমাদের এই গরীব এলাকার সরকারি হাসপাতাল-টিকে ভালো ভাবে চালিয়ে আমাদের একটু উন্নয়ন করুন।

এলাকাবাসীর পক্ষে—
প্রণব গাঙ্গুলী
বাউড়িয়া হাওড়া

মুর্শিদাবাদের কান্দীতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২০শে জুলাই, 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস উদযাপন কমিটি'র উদ্যোগে কান্দীর হ্যালিফক্স হলে একটি আলোচনা সভা সংগঠিত হয়। 'দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধির নেপথ্যে' শীর্ষক আলোচনায় বক্তব্য রাখেন বিশ্বজিৎ হাজরা। 'পরমানু চুক্তি ও তার প্রভাব' শীর্ষক আলোচনায় বক্তব্য রাখেন শুভাশিষ মুখার্জী। দুটি বিষয়েই দেশের শাসকশ্রেণীর পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অঞ্চলের বর্ষীয়ান রাজনৈতিক সংগঠক সুভাষ পান্ডে। কমিটির উদ্দেশ্য ও দিশা সম্পর্কে সভার শুরুতে বক্তব্য রাখেন অন্যতম সংগঠক আশিষ পাত্র। 'কোরাস নাট্য গোষ্ঠী' কর্মসূচীটিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। দেশের শাসকশ্রেণীর মিথ্যে প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপকে বোঝা ও তাকে ঠিকমত মোকাবিলা করতে এই আলোচনা সভা নিঃসন্দেহে এলাকার গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে রসদ দান করেছে।

মালিকী বে-আইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মাইন লাইনের ক্যাজুয়াল শ্রমিকদের লড়াই

অজয় বক্সী: বেহালার চণ্ডীতলায় ছোট্ট খারখানা মাইনলাইন ইঞ্জিনিয়ারিং। সর্বসাকুল্যে প্রায় ৫০ জন কাজ করে। অনেক শ্রমিক অবসর নেওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন কোন স্থায়ী পদে লোক নিয়োগ হয়নি। ফলে কারখানায় ক্যাজুয়াল শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এই সমস্ত শ্রমিকরা দীর্ঘ ৫-৬ বছর কাজ করা সত্ত্বেও ই.এস.আই., পি.এফ. ছুটি ইত্যাদি সুবিধা থেকে বঞ্চিত। কর্মরত অবস্থায় কোন দুর্ঘটনা ঘটলেও কোন ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ব্যবস্থা নেই। তার ওপর মালিকের পেটোয়া লেকেরা এদের সাথে অমানবিক আচরণ করতে থাকে।

অবশেষে কারখানার স্থায়ী শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ লড়াই তাদের অনুপ্রাণিত করে। আরও জোট বাঁধার পরিকল্পনা করে এই সমস্ত মালিকী ব্যভিচারের বিরুদ্ধে।

এরই মধ্যে একদিন কারখানার বাইরে ইউনিয়ন নথীভুক্ত নয় এক স্থায়ী শ্রমিকের সাথে ক্যাজুয়াল লেবার শম্ভু দাসের কিছু বচসা বাধে। আর মালিক এই সুযোগে ক্যাজুয়াল শ্রমিকদের মধ্যে ভাঙন ধরাবার জন্য বে-আইনীভাবে সম্ভ দাসকে বসিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ক্যাজুয়াল শ্রমিকরাও সম্ভ দাসের পুনর্বহালের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। কারখানায় স্থায়ী শ্রমিকদের সমর্থন থাকায় বাইরের লোকদের দিয়ে কাজ করাতে অসমর্থ হয়। স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিকরা গেটসভা করে মালিকের এই অমানবিক বে-আইনী কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করে এবং বিনা শর্তে সম্ভ দাসকে পুনর্বহাল না করলে ভবিষ্যতে পরিণতি খারাপের দিকে যেতে পারে বলে জোর দিয়ে ঘোষণা করে।

ম্যানেজমেন্ট সার্বিক অবস্থা বিচার করে বিনা শর্তে সম্ভ দাস সহ অন্যান্য ক্যাজুয়াল শ্রমিকদের কাজে নিয়োগ করে। এবং প্রথমে ৩ জন, তারপর ধাপে ধাপে অন্যান্যদের ই.এস.আই., পি.এফ. ও ছুটি ইত্যাদি শর্ত মেনে নেয়।

ক্যাজুয়াল শ্রমিরা লড়াইয়ের ফলে এই ছোট্ট জয়ে উৎসাহী। তারা বুঝেছে চুপচাপ থাকার ফলে তারা এতদিন এই সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। এই ছোট্ট জয় আজ মাইন লাইন-এর সমস্ত শ্রমিকদের আগামী দিনে লড়াইয়ের প্রেরণা জোগাবে।

শ্রমিক বিক্ষোভে উত্তাল মিশর

প্রদীপ রায়

লাগামছাড়া মুদ্রাস্ফীতি, স্বল্প দামের রুটির অভাব ও প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারক জমানার প্রতি তীব্র অনাস্থা জনমানসে যে ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে তাই বিস্ফোরণের আকারে আজ দেখা দিয়েছে উত্তর আফ্রিকার দেশ মিশরে। গত জানুয়ারি মাসেই সে দেশের সর্ববৃহৎ শিল্প সংস্থা মিশর স্পিনিং এন্ড উইভিং কোম্পানি-র ২৫ হাজার শ্রমিক স্ট্রাইক কমিটি গঠন করে ৬ই এপ্রিল ধর্মঘটের দিন ঘোষণা করে। ন্যূনতম মজুরী বৃদ্ধির দাবিতে (২২২ ডলার মাসিক মজুরী)-ই শ্রমিকদের এই ধর্মঘট কর্মসূচী। ২০০৫ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের দাম মিশরে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং এ বছরের মার্চ মাসে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫.৮ শতাংশ। সে দেশের বেশিরভাগ মানুষের প্রয়োজনীয় ক্যালোরির প্রধান উৎস ভর্তুকি প্রাপ্ত রুটির তীব্র অভাব অবস্থার অবনতি ঘটায়। অ-ভর্তুকি প্রাপ্ত রুটির দাম শেষ দু'বছরে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রুটির দীর্ঘ লাইনে বাক-বিতণ্ডা, মারামারি হয়ে উঠেছে পরিচিত দৃশ্য যার ফলে মারাত্মকভাবে জখম হওয়া এমনকি মৃত্যুর মত ঘটনাও ঘটছে সেখানে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মিশরের ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে।

২ এপ্রিল মিশরের নিরাপত্তা রক্ষীরা ধর্মঘট রুখতে মহল্লা-আল-কুবরা (রাজধানী কায়রোর উত্তরে অবস্থিত এক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প শহর) ও মিশর স্পিনিং কারখানায় মোতায়েন হয়ে যায়। স্ট্রাইক কমিটির নেতৃত্বস্থানীয় কর্মী সৈয়দ হাবিব, আল-আটার প্রভৃতিদের উপর ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্যে চাপ সৃষ্টি করা হয়। পাশাপাশি কোম্পানি কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের মাসিক বেতনে আংশিক বৃদ্ধি, খাদ্য অনুদান, বিনামূল্যে যাতায়াত করবার ব্যবস্থা করার কথা ঘোষণা করে শ্রমিকদের ধর্মঘটের রাস্তা থেকে ফিরিয়ে আনার মরিয়া চেষ্টা চালায়। মিশরের ন্যাশনাল কাউন্সিল অন্ ওয়েজেস এবং সরকার মদতপুষ্ট ইজিপশিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন শ্রমিকদের দাবি করা ন্যূনতম মাসিক মজুরী (২২২ ডলার যা বিশ্ব ব্যাঙ্ক দ্বারা স্থিরীকৃত চার জনের পরিবার-এর মাথাপিছু ২ ডলার প্রতিদিন-এর দারিদ্র সীমার থেকেও কম) থেকে অনেক কম মজুরীতে ফয়সালা করবার জন্য এই সময়েই আলোচনা শুরু করে এই সংগ্রামকে ভেঙে দেবার ষড়যন্ত্র করতে। এই বহুমুখী আন্দোলনের মুখে দাঁড়িয়ে স্ট্রাইক কমিটি ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু বহু শ্রমিকই এই সিদ্ধান্তে অখুশি হয়। ৬ এপ্রিল কারখানার কিছু শ্রমিক শহরের প্রধান স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতে থাকে রুটির দাম বৃদ্ধির বিরুদ্ধে। কিছু স্থানীয় তরুণ যুবক ও মহিলাও তাদের সাথে ভীড় জমায়। ভাড়া করা গুন্ডা ও নিরাপত্তা রক্ষীরা এই জনতাকে আক্রমণ করলে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। টিয়ার গ্যাস ও লাঠি নিয়ে বেপরোয়া হামলা চালানো বলে হিংসাত্মক বিক্ষোভ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পরে। উত্তেজিত শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ শাসক দল (ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক পার্টি)-এর আসন্ন পৌর নির্বাচনের ব্যানার জ্বালিয়ে দেয়। পরের দিন (৭ এপ্রিল) হাজার হাজার সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে অংশ নিতে রাস্তায় নেমে পরে। তাঁরা প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারকের এক বিশাল পোস্টার টেনে ছিঁড়ে দেয়। নিরাপত্তা বাহিনী ৩৩১ জনকে গ্রেপ্তার করে, শত শত মানুষকে লাঠিপেটা করে, আশঙ্কাজনকভাবে জখম হয় নয়জন। আহমেদ আলি মুবারক (১৫ বছর) বুলেটবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। ৮ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী আহমেদ নাজিফ মহল্লা আল কুবরাতে ছুটে আসেন এবং মিশর স্পিনিং কোম্পানির শ্রমিকদের এক মাসের মজুরীর সমান বোনাস ও অন্য টেক্সটাইল শ্রমিকদের ১৫ দিনের বোনাস দেবার কথা ঘোষণা করেন। বিনিয়োগ মন্ত্রী রশিদ মহম্মদ রশিদ উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা, ভর্তুকি প্রাপ্ত বিশেষ বেকারি চালু করা, চাল-তেল-চিনি-ময়দা প্রভৃতি কোঅপারেটিভ স্টোরস্ পুনরায় চালু করার প্রতিশ্রুতি দেয়। শহরের জেনারেল হসপিটালে চিকিৎসার সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারী দেবার কথাও ঘোষণা করা হয়। মিশর স্পিনিং কোম্পানি সে দেশের প্রথম ও সর্ববৃহৎ আধুনিক কারখানা হওয়ার কারণে এই কারখানাটি মিশরে এক গুরুত্ব বহন করে। সরকার পক্ষ তাই নানা প্রতিশ্রুতি, অনুদান দিয়ে এই কারখানার শ্রমিকদের শান্ত করার চেষ্টা চালিয়েছে। মহল্লা শহরের শ্রমিকরা কিন্তু মিশর স্পিনিং এন্ড উইভিং কোম্পানির শ্রমিকদের এই সংগ্রামকে জাতীয় ধর্মঘটে পর্যবসিত করতে চেয়েছিলেন। এই কর্মসূচীর সমর্থনে দাঁড়ায় মিশরীয় পরিবর্তনকামী আন্দোলনের মঞ্চ কিফায়া (বহু মতাবলম্বী গণতন্ত্রকামী একটি সমন্বয়), নাসের পন্থী কারামা পার্টি, ইস্লামিষ্ট লেবার পার্টি, বার এসোসিয়েশন প্রভৃতি সংগঠন। শ্রমিকদের মধ্যে সক্রিয় কমিউনিস্ট পার্টি, সোসাল ডেমোক্রাটিক পার্টি এবং ট্রটস্কিপন্থী বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীরাও ভূমিকা পালন করে। ৬ এপ্রিল বহু জায়গায় নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের নজিরবিহীন মূল্যবৃদ্ধি ও ন্যূনতম মজুরী (মাসিক ২২২ ডলার)-এর দাবিতে ধর্মঘট পালিত হয়। বার এ্যাসোসিয়েশন ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়। বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়। রাজধানী কায়রো ও অন্যান্য শহরে গাড়ি-ঘোড়া, বাসই চলাচল করে। যদিও প্রায় একশ' রাজনৈতিক কর্মীকে ৬ এপ্রিলের আগেই গ্রেপ্তার করার কারণে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালন করা সম্ভব হয়নি। ৯ এপ্রিল কিফয়া-এর নেতা জর্জ ঈশাক ও আরও ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করা ও সরকারি ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে হিংসাত্মক আক্রমণ চলানোর অভিযোগ আনা হয়। ১১ এপ্রিল পঁচিশ জন বুদ্ধিজীবী মহল্লা শহরের আক্রান্ত শ্রমিকদের পরিদর্শনে এলে তাদের শহরে ঢোকার ২০ কিলোমিটার আগেই থামিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে মহল্লা আল কুবরা শহরের শিল্প শ্রমিকদের নেতৃত্বে এক গণবিক্ষোভে ধূমায়িত হয়ে চলেছে। প্রায় চার লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট-বিক্ষোভ সামিল হয়।

আসলে নয়া উদারনৈতিক নীতি অনুসরণ করে এক নয়া মিশর গড়ে তোলার প্রচেষ্টাই এই ব্যাপক গণবিক্ষোভের পিছনে কাজ করছে যেখানে সে দেশের ১০ শতাংশ মানুষই কেবল সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পেতে পারবে। আর লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-সরকারি কর্মচারীদের অন্ধকার ভবিষ্যৎ-এর মুখোমুখি হতে হবে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্কের নির্দেশিত পথে এগিয়ে যেতে মিশর এখন অর্থনৈতিক সংস্কার ও স্ট্রাকচারাল এ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছে। ২০০২ সালের মাঝামাঝি ১৯০টি সরকারি সংস্থাকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ২০০৪ সালের আহমেদ নাজিফ সরকার ক্ষমতায় বসে আরও ১৭টি সরকারি সংস্থা বিক্রি করে ফেলেছে। একদিকে নিরাপত্তাহীনতা, সংশয় বৃদ্ধি পেয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে, অন্য দিকে মজুরীও হ্রাস পেয়েছে ব্যাপকভাবে। বেসরকারি মালিকরাও বকেয়া পাওনা, সমাজকল্যাণকারী সুযোগ-সুবিধা দিতে রাজি নয়। ধনী-দরিদ্রর বৈষম্যও বৃদ্ধি পেয়েছে দারুণভাবে। এই অবস্থার কারণেই ২০০৪ সাল থেকে ধর্মঘট-বিক্ষোভ-এর ঘটনা ক্রমে ক্রমে মিশরে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ২০০৪ সালের প্রথম অর্দ্ধে ৭৪টি এবং নাজিফ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯টি যৌথ আন্দোলনের ঘটনা ঘটে। ২০০৬ সালে ২২২টি ধর্মঘটের ঘটনা ঘটে। আর ২০০৭ সালে এই রকম ৫৮০টি ঘটনা ঘটে। ২০০৭ সালেই টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি থেকে ধর্মঘট বিক্ষোভের বার্তা বেকারি, অয়েল, ট্রান্সপোর্ট, কায়রো মেট্রো, সিমেন্ট, ফুড প্রেসেসিং, স্টিল প্ল্যান্ট প্রভৃতি ইন্ডাস্ট্রিতে ছড়িয়ে যায়। ২০০৭-এর ডিসেম্বরে ৫৫ হাজার ট্যাক্স কালেক্টর ধর্মঘটে যায় ও তাদের দাবি ছিনিয়ে আনে। এই প্রেক্ষাপটের উপর দাঁড়িয়েই গত এপ্রিল মাসে মহল্লা-আল-কুরবার শিল্প শ্রমিকরা ধর্মঘটের কর্মসূচী গ্রহণ করে। শিল্প-শ্রমিকদের সংগ্রামই আজ ডাক্তার, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার মানুষদের সংগ্রামের ময়দানে টেনে আনছে। ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের পর এই সংগ্রামই আজ মিশরের সবচাইতে বৃহৎ ও ধারাবাহিক সামাজিক আন্দোলন।

তিব্বত প্রশ্নে আন্তর্জাতিক কূটনীতি

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

ফেলার স্বার্থে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে যথাসম্ভব চেষ্টা চালাবে, সে তো বেশ স্বাভাবিক। এবং এই প্রথম নয়, বহুদিন আগে থেকেই তারা 'তিব্বত তাসটিকে' সযত্নে ব্যবহার করে আসছে। এ বারও তারা তাদের প্রচার মাধ্যমকে ভালো মতোই কাজে লাগিয়েছে। উদাহরণ সি এন এন। চিনের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহুল আলোচিত বাণিজ্য ঘাটতি নিয়ে বলতে গিয়ে সি এন এন-এর নেটওয়ার্ক কমেন্টেটর তিব্বত প্রশ্নেও ঢুকে পড়েন এবং চিনা নেতাদের 'এক দঙ্গল গুণ্ডা' আখ্যায় অভিহিত করেন। স্বভাবতঃই এই মন্তব্য চিনা নেতাদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সঞ্চার করে এবং তাঁরা সি এন এন-কে এর জন্য ক্ষমা চাইতে বলেন। বোঝাই যায়, এই মন্তব্য মোটেই তিব্বতী জনগণের প্রতি সহমর্মিতা প্রসূত নয়, বরং দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে বিরোধেরই এক বহিঃপ্রকাশ। তবে কেবল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই নয়, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, অস্ট্রেলিয়াও নিজ নিজ স্বার্থের জায়গা থেকে চিনকে এক হাত নিতে ছাড়েনি। অন্য দিকে লক্ষণীয় হল রাশিয়ার ভূমিকা। তারা কার্যত নীরবই থেকেছে। কারণ খুব স্পষ্ট। বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদেরও তো প্রতিদ্বন্দ্বী। তিব্বত প্রশ্নে তাই এমন কোনও ভূমিকা তারা নিতে চায়নি যাতে সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর সুবিধা হয়; বিশেষত আরও এই কারণে যে, প্রত্যক্ষ মার্কিন মদতে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ তার পুরনো প্রভাবাধীন পূর্ব ইউরোপ ছিন্নভিন্ন হয়ে তার অনেকটাই যখন আজ মার্কিন প্রভাবাধীন ক্ষেত্রে পরিণত। এটাও হল সেই বহু পরিচিত নীতিহীন কূটনীতিরই এক প্রকাশ। তবে আরও লক্ষণীয় হল লাতিন আমেরিকার নতুন বামপন্থী শাসনাধীন সরকারগুলোর ভূমিকা। তারাও কার্যত নিশ্চুপ থেকেছে। কেননা তারাও চায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার নামে চিনের সাথে আঁতাতবদ্ধ থাকতে, চিনকে কোনওভাবেই না চটাতে। এটাও কি নীতিহীনতা নয়? তিব্বত প্রশ্নে নিজেদের অবস্থান স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করাটা কি কাম্য ছিল না? আমাদের এখানকার বামফ্রন্ট সরকারের সাথে, অন্তত এই প্রশ্নে, তাদের নীতিগত ফারাকটা তা হলে আমরা বুঝবো কী দিয়ে? আরও ভাবায় নেপালের মাওবাদী নেতা প্রচণ্ডর সাম্প্রতিক এই বিবৃতি যে, নেপালে বসবাসকারী তিব্বতীদের চিন-বিরোধী আন্দোলন তাঁরা বরদাস্ত করবেন না।

বস্তুত, বিশ্ব রাজনীতির এখন যা অবস্থা, তাতে জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে চলার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। আর দলাই লামারও তেমন কোনও বাসনা নেই যে তিনি তিব্বতী জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখবেন। বরং ঘটনা ঠিক তার উল্টো। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মদত আদায়ের জন্য তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি সফর করে চলেছেন। আহ্বানও তাঁর এই দেশগুলোর সাধারণ জনগণের কাছে নয়, রাষ্ট্রশক্তির কাছে, শাসকশ্রেণীর কাছে। গত শতকের প্রথমার্ধে যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলোর প্রবল আবির্ভাব দেখা গিয়েছিল, তখন পরিস্থিতিটা ছিল অনেক অন্যরকম। পাশাপাশি তখন ছিল সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনেরও একটা প্রবল স্রোত। সে কারণে সমগ্র বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই দুই আন্দোলনের মেলবন্ধন ঘটারও এক অপূর্ব সম্ভাবনা হাজির ছিল। কিন্তু আজকের পরিস্থিতিটা তো অনেক আলাদা। সে কারণে আন্দোলনের নেতৃত্ব হিসাবে দলাই লামার প্রকৃত এক বিকল্প, যিনি সত্যিই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, তার হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। তবে তিব্বতী জনগণকে আজ না হলেও কাল ঠিকই বুঝে নিতে হবে যে, সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণে থেকে এবং ধর্মীয় মৌলবাদের উপর ভর করে আর যাই হোক তাদের পক্ষে মূল্যবান খুব কিছু আদায় হবে না। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, চিন থেকে তিব্বতকে আলাদা করা গেলো, তাতে চিন হয়তো দুর্বল হবে, কিন্তু আরও শক্তিশালী হবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। সেটা যদি তিব্বতী জনগণ না চান, তা হলে দলাই লামার প্রকৃত বিকল্পের কথা তাঁদের ভাবতেই হবে, প্রত্যাখান করতে হবে সমস্ত ধরনের সাম্রাজ্যবাদী মদতকেও। বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনগণ তাঁদের কাছে সেই আশাটাই করবে।

নির্দোষ শ্রমিকরা মুক্ত

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

কমিশনার, ডিস্ট্রিক্ট লেবার কমিশনার, সাব-ডিভিশনাল অফিসারকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। গত ১৫ জুন শ্রমিকদের এক বিশাল মিছিল টিটাগড় এলাকা পরিক্রমা করে খড়দা থানায় ডেপুটেশন দেয়। থানার আই.সি. কাছে ১৫ মে সভায় শ্রমিকদের উপর হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবি তোলা হয়। মাঠকল জুটমিলে যাবতীয় গণ্ডগোলের নায়ক জীতেন্দ্র শুক্লাকে এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি কেন তা জানতে চাওয়া হয়। এই ডেপুটেশনের দিন কয়েকের মধ্যে জানা যায়, সভার হামলাকারী যে কয়েকজনের নামে থানায় এফআইআর করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে চারজন কোর্টে আত্মসমর্পণ করে। এই ঘটনা শ্রমিকদের মনোবল আরো বাড়িয়ে দেয়। এদিকে লেবার কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন দিতে গিয়ে জানা যায়, মিলের ম্যানেজমেন্ট এর সাথে সি আই টি ইউ, আই এন টি ইউ সি-সহ চৌদ্দ ইউনিয়নের মিটিং-এ ম্যানেজমেন্ট মিল খোলার শর্ত হিসেবে বিয়াল্লিশ জন শ্রমিকের গেটবাহার করে মিল চালু হবে, মিলের মধ্যে পুলিশ পাহারার বন্দোবস্ত থাকবে এবং মিলের বাইরে গেটের সামনে কোনো মিটিং করা যাবে না। এসএমইউ-র পক্ষ থেকে শ্রমিকদের এই শর্ত জানানোয় তাদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। প্রশ্ন ওঠে, ম্যানেজমেন্ট এরকম অপমানজনক শর্ত শুনে সি আই টি ইউ, আই এন টি ইউ সি-সহ অন্যান্য ইউনিয়নগুলো কোনোরকম প্রতিবাদ জানায়নি কেন? তারা শুধু নিজেদের মধ্যে পাঁচ-ছয় জন মিলে গোপনে মিটিং করছে, শ্রমিকদের সঙ্গে কোনো আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করে না। এই ইউনিয়নগুলো যে ম্যানেজমেন্ট ও মিল মালিকের হয়ে এতদিন দালালি করে এসেছে তা আজ শ্রমিকদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। শ্রমিকদের ন্যায্য পিএফ এবং গ্র্যাচুইটির দাবি নিয়ে এসএমইউ যে আন্দোলন শুরু করেছে, মিলের সমস্ত শ্রমিকদের সমর্থনে আজ তা এক ভিন্নমাত্রা পেয়েছে, তাই এখন অন্য ইউনিয়নগুলো এলাকায় মিছিল-মিটিং করলে তাতে শ্রমিকদের যোগদান তলানিতে এসে ঠেকেছে। সি আই টি ইউ-সহ অন্যান্য ইউনিয়নগুলো শ্রমিকদের কাছে আজ ব্রাত্য হয়ে গেছে। মিল ম্যানেজার জীতেন্দ্র শুক্লাকে নিজের নিরাপত্তার জন্য বাইরে থেকে পাঁচজন নিরাপত্তারক্ষী আনাতে হয়েছে। মাঠকলের এই আন্দোলনের খবর পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সিপিআইএমএল(এনডি), সিপিআই এমএল(এসওসি), এমকেপি, সিপিআই এমএল(লিবারেশন), সিসিআর (এমএল), সিপিবি-সহ ৯টি বামপন্থী রাজনৈতিক দল। তাদের উদ্যোগে গত ১৫ জুলাই ধর্মতলার মেট্রোর সামনে বেলা একটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত ছয়ঘণ্টার এক অবস্থান বিক্ষোভের আয়োজন হয়। সেখান থেকে পাঁচসদস্যের এক প্রতিনিধি দল রাজ্য সরকারের হোম সেক্রেটারীর সাথে দেখা করে নির্দোষ শ্রমিকদের মুক্তি এবং মিল খোলার দাবিতে ডেপুটেশন জমা দেয়। বলা হয়, প্রশাসন কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ না নিলে আগামী দিনে শ্রমিকেরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবে।

তিব্বত প্রশ্নে আন্তর্জাতিক কূটনীতি

চন্দন দেবনাথ

কিছুটা আন্তর্জাতিক চাপে আর বেশিরভাগটাই তিব্বতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে স্তিমিত করার তাগিদে চিন সরকার গত ২৫শে এপ্রিল যেন বা কিছুটা অপ্রত্যাশিত ভাবেই দলাই লামার প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠকে বসার ইচ্ছা ঘোষণা করে বসে। ভারতে আশ্রিত ‘তিব্বতের নির্বাসিত সরকার’-এর দুই প্রতিনিধি ২রা মে চিনের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান। আলোচ্য বিরোধ নিয়ে বৈঠক অবশ্য আগেও বার কয়েক হয়েছে। ২০০৭ সাল অবধি ছয় বার। কোনও বারই কোনও মীমাংসা সূত্র বেরিয়ে আসেনি। এবারও তাই হল। মাঝপথেই চিনা প্রতিনিধিরা আলোচনা ভেঙে দেন এই অজুহাতে যে, অলিম্পিক গেমস আয়োজনে ব্যাঘাত ঘটানোর কর্মকাণ্ড থেকে দলাই লামা নিবৃত্ত না হলে এই আলোচনা চলতে পারে না।

বৈঠক যে ফলপ্রসূ হবে না, সেটা অবশ্য আগে থেকেই স্পষ্ট ছিল। কেননা, বৈঠকে বসানোর জন্য আন্তর্জাতিক চাপ আসার পর থেকে চিন সরকার বারংবার শর্ত হিসাবে মূলত দুটো কথা বলে এসেছে এক, দলাই লামাকে সত্যিই তিব্বতের স্বাধীনতার দাবি ছাড়তে হবে; দুই, সবরকম হিংসাশ্রয়ী পথ ছাড়তে হবে। দলাই লামা অবশ্য বারেবারেই বলে এসেছেন, সাম্প্রতিক আন্দোলনটা আদৌ তাঁর উসকানি প্রসূত নয়, বরং এটা হল চিনের তিব্বত নীতির বিরুদ্ধে তিব্বতী জনগণের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। বিক্ষোভের এই হিংসাশ্রয়ী প্রকাশ ঘটতে শুরু করেছিল গত ১২ মার্চ থেকে, যেদিন তিব্বতের চিনা প্রশাসন সেখানে ষাট জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করে এই অভিযোগে যে, তাঁরা চিনা গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে তিব্বতকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সালে সংগঠিত মার্কিন মদতপুষ্ট অভ্যুত্থানের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপন লক্ষ্যে নতুন করে বিক্ষোভ সংগঠনের অংশীদার ছিলেন। তাৎপর্যপূর্ণ হল, ঠিক ঐ দিনই দলাই লামা এই বিবৃতি দেন যে, ‘‘প্রায় ছয় দশক ধরে চিনা দমন-পীড়নের অধীনে তিব্বতীদের অনবরত ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতে হয়েছে।’’ এর পরই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। আক্রমণের লক্ষ্যও ছিল মূলত চিনা হান জাতির লোকজনেরা। কিন্তু বিক্ষোভের তীব্রতা ও ব্যাপ্তি যেমনই হোক না, এটা বেশ স্পষ্ট যে, কেবল নিজেদের শক্তির জোরে তিব্বতী জনগণের পক্ষে স্বাধীনতা আদায় করা প্রায় অসম্ভব। সে কথা দলাই লামাও ভালো বোঝেন। যদিও তাঁর একাধিক বিবৃতি অনুযায়ী, ‘স্বাধীনতা’ তাঁর দাবি নয়। তিনি চান ‘স্বশাসন’, যে দাবির সমাধান শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমেই হতে পারে বলে তিনি বলে আসছেন। তবে ঠিক কী ধরনের ‘স্বশাসন’ তাঁর দাবি, তা কিন্তু খুব স্পষ্ট নয়। এই ‘স্বশাসনের’ অর্থ যাই হোক না কেন, সেটাও যে সহজে আদায় হবে না, তা বুঝতে পেরেই বিক্ষোভ চলাকালীন আন্তর্জাতিক দুনিয়ার কাছে প্রকাশ্য এক আবেদনে তিনি বলেন চিনকে আলোচনার টেবিলে বসতে বাধ্য করুন, কারণ এই শক্তি তিব্বতী জনগণের নেই। আমাদের আলোচ্য বিষয় হল, প্রার্থিত এই আন্তর্জাতিক মদতের চরিত্র নিয়েই। আরও পরিষ্কার করে বললে, তিব্বত প্রশ্নে আন্তর্জাতিক কূটনীতির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নিয়ে।

সমস্ত কূটনীতির পেছনেই থাকে কোনও না কোনও একটা নীতি। তিব্বত প্রশ্নেও থাকার কথা। সুতরাং আমরাও যখন এই প্রশ্নে আন্তর্জাতিক কূটনীতিকে বিচার করবো, সুস্পষ্ট একটা নীতির ভিত্তিতেই তা করা উচিত। এক্ষেত্রে আমাদের নীতি কী হবে? বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়ে এই প্রশ্নে সার কথাটুকু অন্তত বলে নেওয়া দরকার।

কোনও সন্দেহ নেই যে, তিব্বত সমস্যা হল আসলে জাতিগত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সংক্রান্ত একটি সমস্যা। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রগতির পথেই এই সমস্যার সমাধান হতে পারতো। কিন্তু বিগত বিশ শতকের গোড়ায় অনেক আশার আলো নিয়ে রাশিয়ার বুকে তেমন সম্ভাবনা আবির্ভূত হলেও সত্যিকার অর্থেই বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আত্মপ্রকাশ পরে আর ঘটতে দেখা যায়নি— পুঁজির তদানীন্তন ঘাঁটি পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা থাকার কারণে। পরে রুশ ও চিনা কম্যুনিস্ট পার্টির অধঃপতনের কারণে সংশ্লিষ্ট জাতিগত সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধানের বদলে নতুন করে সমস্যাগুলির আবার আত্মপ্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। তিব্বতী জাতি সমস্যা তেমনই একটি অসমাধিত সমস্যা। এ জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে প্রথমেই যেটা স্বীকার করা উচিত তা হল, প্রতিটি জাতিরই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকা উচিত। আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থ অবশ্য সব সময় দমন-পীড়নকারী জাতিরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নাও হতে পারে। যদিও তিব্বতী জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দাবিয়ে রাখা কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়। আবার স্বাধীনতা কিংবা স্বায়ত্তশাসন অর্জনের আন্দোলনকে একেবারে নিঃশর্তভাবে সমর্থনও করা যায় না। যদি দেখা যায় আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের নামে এই আন্দোলনগুলি কোনও না কোনও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মতলব হাসিলের এক উপায় হিসাবে কাজ করে চলেছে, তা হলে নিঃশ্চয় সমর্থন জোগানোর কোনও জায়গা থাকে না। বস্তুত, শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী স্বার্থের বিচারে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের আন্দোলনগুলির অভিমুখ হওয়া উচিত বিদ্যমান সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থাটার বিরুদ্ধেই। এই নীতিগত অবস্থানে দাঁড়িয়েই আমাদের বিচার করতে হবে তিব্বত প্রশ্নে আন্তর্জাতিক কূটনীতির ভূমিকাকে।

তিব্বত প্রশ্নে ভারতীয় শাসকশ্রেণীর মধ্যে মূলতঃ দুটো ঝোঁক লক্ষ করা যাচ্ছে। এক পক্ষের মতো হল, ভারত-চিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে দলাই লামা দীর্ঘ দিনের এক বোঝাস্বরূপ। স্মরণ করা যেতে পারে, দলাই লামা এবং তাঁর অনুগামীরা ১৯৫৯ সালের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর যখন ভারতে শরণার্থী হিসাবে আশ্রয় নেন, তখন চিন-বিদ্বেষী কিছু ভারতীয় মুম্বাই কনস্যুলেটে মাও সে তুং-এর টাঙানো ছবির উপর ডিম ও টমাটো ছুঁড়ে তাঁদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালে ভারত ও চিন সরকারের মধ্যে সম্পাদিত পঞ্চশীল চুক্তিতে তিব্বতকে চিনের অংশ হিসাবে ভারত স্বীকার করে নেওয়া সত্ত্বেও এ জাতীয় ঘটনা যখন ঘটলো, এবং তখন ২৩ বছরের তরুন দলাই লামাকে ভারতে সাদরে অভ্যর্থনা জানানো শুধু নয়, গোটা বিশ্বের কাছে মুক্ত ভাবে তাঁর কথা বলতে দেওয়া হল, তখন এ ঘটনায় চিন সরকার স্বভাবতঃই যথেষ্ট রুষ্ট হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই, দিল্লির জওহরলাল নেহরু ইউনিভারসিটির ইষ্ট এশিয়ান স্টাডিস ডিপার্টমেন্টের শ্রীকান্ত কোন্ডাপল্লীর বক্তব্য হল, ‘‘ভারতীয় প্রতিষ্ঠান প্রচণ্ড ভাবে বিশ্বাস করে যে, দলাই লামাকে আশ্রয় দেবার জন্য ভারতকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে, যা ১৯৬২-তে চিনের সাথে যুদ্ধের দিকে চালিত হয়। সে কারণেই ভারতীয় আমলাতন্ত্রের একের পর এক প্রজন্ম তার তিব্বত তাসটা ছুঁড়ে ফেলতে চেয়েছে।’’ স্বভাবতঃই, এবারের ঘটনা ভারত সরকারকে এক উভয়সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়েছে বলে এঁরা মনে করছেন। আর সেই উভয়সংকট হল, এমন কৌশল নিয়ে চলা, যাতে চিনকে চটানোও যেমন হবে না, আবার তোষামোদ করা হচ্ছে বলেও মনে হবে না। এ জাতীয় বিশেষজ্ঞদের অভিমত হল, তিব্বত প্রশ্নে চিন-বিরোধী অবস্থান নেওয়াটা যেমন ঠিক হবে না, আবার চিনকে তুষ্ট করতে ভারতে বসবাসকারী তিব্বতীদের চিন-বিরোধী আন্দোলনের উপর দমন-পীড়ন নামিয়ে আনাটাও হবে চিনের কাছে একটা ভুল সংকেত পাঠানো। স্পষ্টতঃই, এঁরা মনে করছেন, ভারতের মাটিতে দলাই লামার দীর্ঘ উপস্থিতি ভারতের কাছে অবাঞ্ছিত এক বোঝাস্বরূপ। ঠিক বিক্ষোভ চলাকালীন সময়েই ধর্মশালায় গিয়ে দলাই লামার সাথে মার্কিন প্রতিনিধি সভার স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির সাক্ষাৎ করাটা, এবং শুধু তাই নয়, নিরাপত্তার গাফিলতির সুযোগ নিয়ে দিল্লিস্থ চিনের এমব্যাসির বাউন্ডারি ওয়াল টপকে কিছু বিক্ষুব্ধ তিব্বতীর হঠাৎ ঢুকে পড়া, এবং তার ফলস্বরূপ চিনে নিয়োজিত ভারতের রাষ্ট্রদূত নিরুপমা রাওকে মাঝ রাতে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে চিনের কড়া প্রতিক্রিয়া জানানো, এ সবই ছিল অবাঞ্ছিত এবং এই সবটাই হয়েছে এখানে দলাই লামার উপস্থিতির কারণেই।

বোঝাই যায়, এঁদের ভেতরের ইচ্ছাটা হল, দলাই লামার বোঝাটা এবার ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলা। ভারতীয় শাসকশ্রেণীর এই অংশটার এই মনোভাবের পেছনে রয়েছে মূলতঃ অর্থনৈতিক হিসাব চিনের সাথে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক লেনদেন। আবার অন্য একটা অংশও আছে, যাদের বক্তব্য হল, চিনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে ‘তিব্বত তাসটিকে’ ব্যবহার করার ব্যাপারে ভারত বরাবরই অবহেলা ক’রে এসেছে। প্রাক্তন ভারতীয় কূটনীতিবিদ, জি পার্থসারথী যেমন বলেছেন, ‘‘মানুষকে তাস বলাটা যদিও ঠিক না, কিন্তু চিনকে ডিল করার ক্ষেত্রে তিব্বত আমাদের একটা নৈতিক কর্তৃত্ব জুগিয়েছে। ...এই কর্তৃত্বটা যদি আমরা কাজে লাগাই, চিন তার সীমান্তের দাবিতে কম আগ্রাসী হবে।’’ (ঠিক এই কথাটাই আনন্দবাজার পত্রিকা তার একটা সম্পাদকীয়তে কোনও রকম রাখঢাক না রেখেই লিখেছিল— তিব্বতীদের বিক্ষোভ যখন চরমে, সেই সময়ে।) স্বাভাবিক যে, ভারতে আশ্রিত দলাই লামা ও তাঁর অনুগামীদের প্রতি পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর এই সতর্কবাণী যে, এমন কোনও রাজনৈতিক কার্যকলাপে তাঁদের লিপ্ত হওয়া উচিত নয়, যা ভারত-চিন সম্পর্কের ক্ষতি করে, পার্থসারথীর মতো কূটনীতিবিদদের মোটেই পছন্দ হয়নি। যেমন তাঁর এই কথা যে, তিব্বতে হিংসাত্মক বিক্ষোভ প্রদর্শনে দলাই লামার ইন্ধন আছে, চিনের এই অভিযোগের জবাবে দলাই লামার প্রত্যুত্তরকে মোটেই ‘রাজনৈতিক কার্যকলাপ’ বলে অভিহিত করা যায় না।

নিঃসংশয়েই বলা যায়, শেষোক্ত এই দ্বিতীয় পক্ষের সুর স্পষ্টভাবে চিন-বিরোধী হলেও মোটেই সেই সুর সাধারণ তিব্বতী জনগণের প্রতি দরদ প্রসূত নয়। এখানে বরং আছে আন্তর্জাতিক আঙিনায় চিনের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠার সেই পুরনো বাসনাটা আজও পূরণ করতে না পারার ব্যর্থতা প্রসূত জ্বালারই এক ধরনের বহিঃপ্রকাশ। তিব্বত ইস্যুটা এক্ষেত্রে সত্যিই তাঁদের কাছে একটা তাসের মতোই। প্রথম পক্ষের সাথে তাঁদের মতানৈক্যটা আদৌ এমন কোনও নীতিগত বিরোধ নয়, যেখানে বিরোধের কেন্দ্রে সত্যিই আছে জাতিগত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্ন। মতানৈক্য এখানে কেবল চিনের সাথে এখন ঠিক কেমন কূটনৈতিক সম্পর্ক কাম্য, সেই প্রশ্নকে ঘিরে। অর্থাৎ নীতি নয়, বিরোধ কূটনীতি নিয়ে। তিব্বতী জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের আন্দোলনের ভুল-ঠিক, ত্রুটি-খামতি, এসব সত্যিই এঁদের কারোও কাছেই কোন বিচার্য বিষয় নয়। ঠিক যেন নয় বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর কাছেও। যদিও তিব্বত প্রশ্নে তাদের হস্তক্ষেপে কোনও খামতি নেই।

দলাই লামা যতোই বলুন না কেন যে, তিব্বতীদের সাম্প্রতিক বিক্ষোভের প্রকাশটা ছিল সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত, কোনও সন্দেহ নেই যে ঘটনাটা পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক। এখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরও অবশ্যই একটা ভূমিকা ছিল। এ ঘটনাটা কি তাৎপর্যপূর্ণ নয় যে, যেদিন দিল্লির চাইনিজ এমব্যাসির পাঁচিল টপকে হঠাৎ করে ‘বয়কট অলিম্পিক’ লেখা টি-শার্ট পরে কয়েক জন বিক্ষুব্ধ তিব্বতী যুবক ঢুকে পরে, ঠিক সেদিনই ধর্মশালায় গিয়ে মার্কিন প্রতিনিধি সভার স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি দলাই লামার সাথে দেখা করতে যান? ব্যাপারটা কি নিছকই কাকতালীয়? আদৌ নয়, বরং যথেষ্ট সন্দেহজনক।

তিব্বতে বিক্ষোভ প্রকাশের ঘটনাটার সূত্রপাত এ বছরের ১২ মার্চে হলেও, প্রস্তুতি ছিল অনেক আগে থেকেই। গত বছর জুনেই ‘ফ্রেন্ডস অফ টিবেট’ নামক একটি গোষ্ঠীর এক সম্মেলনে আগামী অলিম্পিক গেমসকে কাজে লাগিয়ে তিব্বত প্রশ্নকে বিশ্বের সামনে উপস্থিত করার উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। সম্মেলন মঞ্চ থেকেই আহ্বান রাখা হয় বিশ্ব জুরে প্রতিবাদ সংগঠিত করার এবং অলিম্পিক গেমস শুরুর দিনেই ভারতে ও নেপালে নির্বাসিত তিব্বতীদের তিব্বতের রাজধানী লাসা অভিমুখে অভিযান শুরু করার। দলাই লামার ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীগুলো এ বছর জানুয়ারি থেকেই তিব্বতে চিনবিরোধী অভ্যুত্থান শুরু করার আহ্বান রাখতে শুরু করে। তাৎপর্যপূর্ণ হল, এ রকমই একটি অভ্যুত্থান আহ্বানকালে ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড মালফোর্ড ধর্মশালায় দলাই লামার সাথে আলোচনারত ছিলেন।

বলে রাখা দরকার যে, শেষোক্ত এই তথ্যগুলো গৃহীত হয়েছে সিপিআই(এম)-ঘেঁষা পাক্ষিক ফ্রন্টলাইন পত্রিকা থেকে। সুতরাং এটা স্বাবাবিক যে, বহু দিন আগেই অধঃপতিত এবং বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সায় পুষ্ট চিনা কম্যুনিস্ট পার্টির সাথে যার এতো সখ্যতা, সেই সিপিআই(এম)-ঘেঁষা পত্রিকায় এই তথ্য পরিবেশনের উদ্দেশ্যই হল তিব্বতীদের বিক্ষোভ আন্দোলনকে সম্পূর্ণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত প্রতিপন্ন করে চিনা পার্টিকে আড়াল করা। তিব্বত প্রশ্নে সিপিআই(এম)-এর নগ্ন চিন-তোষণের আরও প্রমাণ পাওয়া গেছে এই ঘটনায় যে, পশ্চিম বাংলার বামফ্রন্ট সরকার কলকাতার বুকে তিব্বতীদের প্রস্তাবিত প্রতিবাদ মিছিলকে হতেই দেয়নি। এবং এই ভূমিকার জন্য কলকাতার চিনা দূতাবাস তাদের প্রতি যৎপরোনাস্তি সন্তোষও ব্যক্ত করেছে। বলাই বাহুল্য যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অজুহাত দেখিয়ে অবদমিত তিব্বতী জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার এভাবে কণ্ঠরোধ করাকে গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন কোনও মানুষই সমর্থন করতে পারেন না। তবে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকার কথা থাক। ফিরে আসা যাক তিব্বত প্রশ্নে কূটনীতির কথায়।

বিশ্ব রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে চিন যে এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, এ নিয়ে তো আর কোনও সন্দেহ নেই। সুতরাং সেই চিনকে তার তিব্বত নীতির জন্য বেকায়দায়

শেষাংশ ৭ পৃষ্ঠায়

স্বত্বাধিকারী অমিতাভ ভট্টাচার্য কর্তৃক ১১, রাজা রামমোহন রায় সরণী, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক বেঙ্গল লোকমত প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : অমৃত পৈড়া